সোভিয়েত নারী

১০ • ১৯৮২

১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গণসোভিয়েত কমিটিসমূহের প্রথম সর্ব ইউনিয়ন কংগ্রেসে গৃহীত ঘোষণা ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী গঠিত হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘ বা সোভিয়েত ইউনিয়ন। বর্তমানে তার অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্রের সংখ্যা পনের।

লাতভিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র :

- **আয়তন – ৬৩ হাজার ৭০০ বর্গ কিলোমিটার**
- **জনসংখ্যা – ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার**

লাতভীয় জনগণের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কঠিন সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জন করে নিজ দেশে সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ১৯২০ সালের শুরুতে প্রতিবিপ্লবী ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া উৎখাত করতে সক্ষম হয় গণক্ষমতাকে; এর পরে লাতভিয়ায় বিশ বছর ধরে চলে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ার আধিপত্য।

১৯৪০ সালের জুনে বুর্জোয়া শাসনের পতন ঘটানো হয়। মেহনতীদের অভিপ্রায় প্রকাশ করে লোকসভা লাতভিয়াকে ঘোষণা করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিশেবে।

এই কাঁচামালের প্রায় উৎসহীন প্রজাতন্ত্রটি এখন অগ্রণী অর্থনীতি গঠন করে বিকাশ করেছে এলেক্ট্রোনিক, বিদ্যুৎযন্ত্র ও রাসায়নিক শিল্প, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও যোগাযোগ সরঞ্জামের কল কারখানা।

শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে লাতভিয়ার বিজ্ঞান একাডেমি হয়ে উঠেছে অন্যতম বৃহৎ গবেষণা কেন্দ্র। প্রতিবছর রিগার সমুদ্র তীরবর্তী স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রগুলিতে বিশ্রাম করে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক।

ছবিতে : লাতভিয়ার রাজধানী রিগার একটি প্রাচীন মহল্লা।

ফটো : ভ. ভলোদকিম

সোভিয়েত নারী কমিটি ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সচিত্র সামাজিক-রাজনৈতিক ও শিল্পসাহিত্য পত্রিকা ● ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ● প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় রুশ, ইংরেজি, আরবী, বাংলা, হাঙ্গেরীয়, জার্মান, স্পেনীয়, চীনা, কোরীয়, ফরাসী, হিন্দী, ভিয়েতনামী, পর্তুগীজ এবং জাপানী ভাষায়

দশম সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৮২

প্রচ্ছদ পরিচিতি

লিথুয়ানীয় ভাষায় দালিয়া নামের অর্থ 'নিয়তি'। ব্যায়ামকলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী চ্যাম্পিয়ন দালিয়া কুৎকাইতের ক্রীড়াসৌভাগ্য প্রথম দিকে তেমন কিছুতেই প্রসন্ন ছিল না। দশ বছর আগে মা তাকে ব্যায়ামক্রীড়া প্রশিক্ষণের বিভাগে নিয়ে এলে কোচরা বলতে গেলে মোটেই কোনো উৎসাহ দেখান নি তার প্রতি। সমবয়সীদের মাঝে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার কোনো লক্ষণও দালিয়া দেখায় নি দীর্ঘদিন। কোচ ভাইদা কুবিলেনে যতদিন পর্যন্ত না তাকে স্পোর্টস মাস্টার খেতাবের প্রার্থিনী তালিকায় এনে তৎসুলভ প্রশিক্ষণ শুরু করেন ততদিন এমনটিই চলছিল। সহজে ও অল্পদিনেই দালিয়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আওতায় এনে ফেলল – এতে তার সময় লাগে মাত্র তিন মাস। তরুণী ব্যায়ামকুশলিনীর অঙ্গ সঞ্চালনে আসে স্বাভাবিক সাচ্ছন্দ্য, দেখা দেয় 'জাগরণের' শুভ ইঙ্গিত।

১৯৭৮ সালে পানেভেজিসে অনুষ্ঠিত কচি বয়সী ব্যায়ামকুশলিনীদের সর্ব সোভিয়েত প্রতিযোগিতায় প্রথম বিশেষজ্ঞদের চোখে পড়ে দালিয়া আর এক বছর বাদে সর্ব সোভিয়েত ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ অনুমতিক্রমে তাকে অংশ নিতে দেয়া হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের চ্যাম্পিয়নশীপে। বয়স্কদের সঙ্গে প্রথম প্রতিযোগিতাটি তার জন্যে সৌভাগ্যজনক হয়েছিল – দালিয়া পেয়েছিল জুরির উচ্চমান পয়েণ্ট আর দর্শকদের জনপ্রিয়তার পুরস্কার। এর এক বছর পর দালিয়া বিজয়ী হল আরেক অসাধারণ প্রতিযোগিতায় – সে ছিল সোভিয়েত জাতিসমূহের ৭ম অলিম্পিকের চূড়ান্ত পর্যায়ের সব খেলার সবচেয়ে কমবয়সী অংশী, 'কৈশোর' পত্রিকার পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার দেয়া হয় অদ্ভুত সুন্দর একটি পুতুল।

তারপর একদিন এল সত্যিকারের বড়ো বিজয়। গত শরতে তাল্লিনে অনুষ্ঠিত সেরা ব্যায়ামকুশলিনীদের প্রতিযোগিতায় ভিলন্যুসের দালিয়া কুৎকাইতে অর্জন করল তিনটি স্বর্ণপদক, বিজয়ী হল বহু ধরনের সম্মিলিত প্রতিযোগিতার কয়েকটি আলাদা আলাদা আইটেমেও। দেড় বছর বাদে সেই তাল্লিনেই সে সর্ব সোভিয়েত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী চ্যাম্পিয়ন।

ভ. নাইপাক

ফটো: আ. গদুনোভ, ই. কোসিন্‌ৎস

এবারের সংখ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার পনেরোটি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ছবি দেয়া হয়েছে ২০ ও ২১ পৃষ্ঠায়।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

বরাবরের ঐতিহ্য মেনে এ বছরও আমরা পত্রিকার দশম সংখ্যাটি সাজিয়েছি আপনাদের অনুরোধ, পরামর্শ ও আগ্রহের বিষয়াদি বিবেচনার ভিত্তিতে।

এ বছর আমাদের দেশের জাতিসমূহ উদযাপন করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের ৬০ তম বার্ষিকী। এই জয়ন্তী উপলক্ষে অনেক লেখা পড়তে পাবেন দশম সংখ্যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী সমাধিকারের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য প্রসঙ্গে আপনারা জানতে পাবেন সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রম ও সমাজকল্যান সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের সহ সভাপতি ম. ম. ক্রাভচেঙ্কো, সর্ব সোভিয়েত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের আইন বিভাগের প্রধান ভ. ভ. ক্লেপসোভ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ন. প. নিকোল্‌স্কায়া (৪–৫ পৃঃ দেখুন)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রসমূহের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জাতিসমূহের পরিষদের সভাপতি ভ. প. রুবেন (পৃঃ ৮)।

সংক্ষিপ্তাকারে আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর ছাপা হয়েছে ১২, ১৬, ১৭, ৩৭ ও ৪০ পৃষ্ঠায়।

আবার চালু করা হয়েছে 'লৌকিক আচার অনুষ্ঠান' বিভাগটি (১০–১১ পৃঃ দেখুন)।

উত্তরাঞ্চলের স্বল্প জনসংখ্যার বিভিন্ন জাতির জীবন সম্পর্কে পড়তে পাবেন ২৪–২৫ পৃষ্ঠায়।

কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের প্রতিপালন করা হয় কীভাবে তা যাঁরা জানতে আগ্রহী তাঁদের জন্যে ১৩, ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হল 'শৈশব স্মৃতি' নামের একটি নিবন্ধ।

ছোটোদের পাতায় বিশেষ করে এবারের সংখ্যার জন্যে লেখা পাঠিয়েছেন আমাদের পর্তুগালবাসিনী পাঠিকা মারিও জোসে ফের্নান্দেস (২৬–২৭ পৃঃ)।

আমাদের পাঠকদের নির্বাচিত লেখা ছাপালাম ২২-২৩ পৃষ্ঠায়।

৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় পড়তে পাবেন মস্কোর কেন্দ্রীয় ঘোড়দৌড় মাঠের ঘোড়ায় চড়া স্কুল সম্পর্কে নিবন্ধ।

'আমার মাতৃভূমি' আলোকচিত্রের প্রতিযোগিতায় চেকোস্লোভাকিয়ার উইলিয়াম প্রেবুলের পাঠানো কিছু ছবি ছাপালাম ৪০ পৃষ্ঠায়।

এবারের সংখ্যা প্রস্তুত করতে আপনাদের চিঠিপত্র, নানা প্রশ্ন ও পরামর্শ অনেক সাহায্য করেছে। সম্পাদকমণ্ডলী আপনাদের জানাচ্ছে আন্তরিক ধন্যবাদ।

নতুন নতুন চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। পত্রিকা-পাঠক যোগাযোগ দৃঢ় হোক।

'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২' ১৩ই জুনে শুরু হয় স্টকহোম থেকে।

'পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে পরমাণবিক অস্ত্র চলবে না!'

ইউরোপের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জিতে সংযুক্ত হয়েছে আরও একটি পৃষ্ঠা: অনুষ্ঠিত হয়েছে 'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২'। পৃথিবীতে জীবন সংরক্ষণ করা, পরমাণবিক ধ্বংসের হাত থেকে এ বিশাল গৃহটিকে রক্ষা করা – এই একই আকাংক্ষা বিভিন্ন দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও ঘনিষ্ট করে তুলেছে তার একাধিক রুটে।

'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২'র প্রথম রুট – স্টকহোম-মিন্স্ক। তাতে অংশ নিয়েছে উত্তর ইউরোপের সব দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা। পথে তারা সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অতিক্রম করে।

এই শোভাযাত্রার নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। গতবছর উত্তর ইউরোপের দেশসমূহের 'শান্তির জন্য নারীসমাজ' আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা তাদের স্বদেশবাসীদের কাছে আহ্বান জানায় সারা ইউরোপে অপরমাণবিক এলাকা সৃষ্টির সংগ্রামে মিলিত হবার এবং ন্যাটোর ইউরোপীয় সবদেশকে নতুন পরমাণবিক অস্ত্রে ভরে তোলার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। এই আহ্বান সাড়া পেয়েছে শুধু ইউরোপেই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার প্রগতিশীল গণসমাজের মাঝেও। এইভাবে উদ্ভব হয় 'শান্তি শোভাযাত্রা-৮১' – কোপেনহেগেন-প্যারিস, যার স্লোগান হয়ে ওঠে: 'উত্তর ইউরোপ – অপরমানবিক এলাকা', 'আমরা চাই বাঁচতে, পরমাণবিক মৃত্যুতে প্রাণ দিতে নয়', 'ইউরোপে মার্কিন রকেট চলবে না!'। শোভাযাত্রার অংশীদের উদ্দেশে প্রেরিত হয় সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতা ল. ব্রেজনেভের অভিনন্দন বাণী। তার উত্তরে শোভাযাত্রায় অংশীরা উদ্ভব করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথ প্রয়াসে শান্তিপ্রিয় ক্রিয়া – 'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২' আয়োজনের ধারণা। বয়স, জাতি, রাজনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের লোকেদের ঐক্যবদ্ধ করেছে এ শোভাযাত্রা। তার প্রচারপত্রে বলা হয়: 'পরমাণবিক যুদ্ধে ভূগোলক বিনাশের সাধারণ হুমকির বিরুদ্ধে সমবেত সংগ্রামের জন্য দূর করতে হবে সব মতভেদ'।

স্টকহোমের র‍্যালাম্বসহোভ পার্কে যাত্রা শুরু করে তিন শত জন অংশী। আসলে তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি: তাদের অনেকের কাঁধে পৎপৎ করছিল নানা রঙের ফিতে, সেগুলিতে লেখা ছিল শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আগ্রহ দেখানো অন্যান্য সকল লোকের নাম ও ঠিকানা। তাই প্রতিটি ফিতা ছিল শান্তি আন্দোলনের পক্ষপাতী অন্যান্যদেরও উপস্থিতির প্রতীক। শোভাযাত্রার তহবিলে অর্থ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে ফিতাগুলি বিক্রি করা হয় ক্রয়েচ্ছুক সকলকে।

'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২' যখন সোভিয়েত ভূখণ্ডের
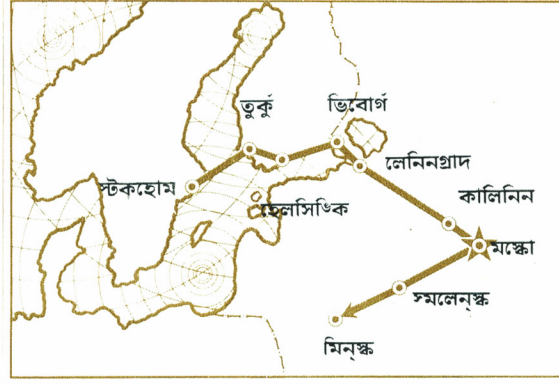
লেনিনগ্রাদ, কালিনিন, মস্কো, স্মলেনস্ক ও মিন্স্কের ওপর দিয়ে যায়, তখন তাতে যোগ দেয় হাজার হাজার সোভিয়েত লোক, শত শত লোক আসে মিলন ও আলোচনা সভায়। সর্বত্রই সোভিয়েত মানুষেরা সশ্রদ্ধ ও উষ্ণ সম্বর্ধনা জানায় 'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২'কে, কেননা তার ধারণা ও স্লোগান তাদের কাছে ঘনিষ্ট ও বোধগম্য। উত্তর ইউরোপের প্রতিনিধিরা, এমনকি যারা সোভিয়েত জনগণের শান্তিপ্রিয়তায় প্রথম দিকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল তারাও এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছে, উপলব্ধি করেছে সম্মিলিত শোভাযাত্রার যৌক্তিকতা।

ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধি ওগুত ইউং এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, – আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিণত হয়ে উঠেছে। আমরা বুঝেছি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার জনগণ যুদ্ধ চায় না।

যুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্টরা মিন্স্কের নিকটস্থ যে খাতিন গ্রামটি তার লোকজন সহ জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দিয়েছিল, সেখানে আয়োজিত জনসভায় আসেন এগারোটি শিশুর জননী জনৈকা বেলোরুশ নারী ভ. সাভোস্তেই। তিনি এসেছেন শোভাযাত্রার অংশীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের প্রতি আবেদন রাখার জন্য:

– পৃথিবীর সব মায়েদের মতো আমিও চাই শিশুদের মানুষ করতে, শান্তিপূর্ণ আকাশের নীচে নির্বিঘ্নে কাজ করতে। যুদ্ধকে যারা ঘৃণা করে তাদের সকলের প্রতি আমার আবেদন: আমার মাতৃকণ্ঠ শুনুন, শান্তিকে রক্ষা করুন, এক হোন এই মহৎ লক্ষ্যের সিদ্ধিতে!

গ্রো নিলসেন – নরওয়ের রাজধানী ওসলোর অধি-

শোভাযাত্রার সোভিয়েত অংশী নাতালিয়া ইৎসকাভা (বাঁয়ে) এবং শোভাযাত্রার অন্যতম সংগঠক, ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এভা নুর্দলান্দ।

বাসিনী, তিনিও জননী। তাঁর বয়স ২৩ বছর, আর তাঁর ছোট মেয়ে মেত্তার – সবে আড়াই। গ্রো নিলসেন ভ. সাভোস্তেইকে চেনেন না, তিনিও একই বিষয়ে উদ্বিগ্ন।

– 'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২'র খবর আমি প্রথম শুনি টেলিভিশনে। আমার তখনই মনে জেগেছিল – আমাকেও যেতে হবে তাদের সঙ্গে। পথের একাংশ, অন্তত হেলসিঙ্কি পর্যন্ত হলেও ভালো। বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করে আমি পথ ধরেছি। আশা করি আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

এই দুই জননীর একত্রে দেখা হয় নি, তবে শোভাযাত্রাটি তাঁদের আবদ্ধ করে তুলেছে আশার সূত্রে। প্রতিটি পদক্ষেপে, পর্যায় থেকে পর্যায়ে, শহর থেকে শহরে এই আশা শক্তি সঞ্চয় করে পরিণত হয়েছে সুদৃঢ় আশ্বাসে।

মিনস্কে আয়োজিত সমাপ্তি জনসভায় শোভাযাত্রার অংশীরা গ্রহণ করেন জাতিসংঘ, বিশ্বের সকল সরকার, পার্লামেণ্ট ও জনগণের প্রতি সম্মিলিত ঘোষণাপত্র। এতে তোলা হয়েছে নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রস্তাবাবলী। তার মধ্যে – সমস্ত দেশের প্রতি পরমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করার দায়িত্ব নেয়ার আহ্বান; সকল ধরনের পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, উৎপাদন ও সংস্থাপন থেকে বিরত থাকার দাবি; বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল সহ পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপকে অপরমাণবিক এলাকায় পরিণত করার দাবি।

'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২'র সমাপ্তিমূলক ঘোষণাপত্রে বলা হয়:

'আমাদের যৌথ শোভাযাত্রা দেখিয়েছে যে পশ্চিম ও পূর্ব বিভিন্ন দেশের সামাজিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা সম্মিলিত উদ্যোগে মানবজাতিকে বিনাশ থেকে সংরক্ষণের পরম জরুরী সমস্যা সমাধানে একমত হতে পারে। জাতিসংঘ, সকল দেশের সরকার, পার্লামেণ্ট ও জনগণের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সম্মতিতে এক হতে, যেমন আমরা হয়েছি 'শান্তি শোভাযাত্রা-৮২'তে।

ন. রামাজানভা

স্টকহোম-মিন্স্ক

ফটো: আ. সেমেলাকা

'গোটা বিশ্বের কোথাও পরমাণবিক অস্ত্র চলবে না!'

শোভাযাত্রার অংশী আর লেনিনগ্রাদের অধিবাসীরা এসেছে পিস্কারেভ সমাধিক্ষেত্রে।

'শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ!'

সোভিয়েত শিল্পী ভ. এর্মাকোভের পোস্টার।

আপনাদের দেশের নারীরা কী ধরনের পেশায় কাজ নিতে বেশি ভালোবাসেন।
প. প্যাটেল (ভারত)

আমরা, হল্যান্ডের নারী সংস্থার সদস্যারা জানতে আগ্রহী আপনাদের দেশের নারীরা কী কী কাজ করতে পারেন ঘরে বসে। সম পর্যায়ী কাজ কারখানায় গিয়ে করলে যে বেতন তারা পেত তা থেকে ঘরে করার মজুরির তফাৎ কত? ঘরে কাজ করার পরিবেশ ও শর্তাবলি কেমন?
ম. ভিসিং (হল্যাণ্ড)

পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রম ও সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের সহসভাপতি **ম. ম. ক্রাভচেঙ্কো।**

সোভিয়েত সংবিধানে লিপিবদ্ধ আইনানুযায়ী আমাদের দেশের নারীরা শিক্ষা, পেশা প্রশিক্ষণ ও শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই সমান অধিকার ভোগ করে।

সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের দেশের মোট নিয়োজিত কর্মীদের ৫১ শতাংশই নারী। তারা কাজ করে শিল্প ও কৃষিতে, চিকিৎসা ও সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানাদিতে, রাষ্ট্রীয় ঋণদান ও বীমা সংস্থায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পন্য বিপননে, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নানা পদে। কিছু তথ্য দেয়া যাক। প্রতি তিন জন প্রকৌশলীর এক জন নারী, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মাঝে তাদের সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের – ৮৬ শতাংশ, গবেষণাকর্মীদের – ৪০ শতাংশ।

মোট শ্রমিক ও চাকুরিজীবিদের ৫১ শতাংশ যে নারী এ থেকে বোঝা যায় উৎপাদনে তাদের ভূমিকা কি বিশাল। উল্লেখযোগ্য যে এ ভূমিকাটি উৎপাদনের উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োগ বাড়ছে, উন্নতি হচ্ছে উৎপাদন প্রযুক্তির, হ্রাস পাচ্ছে দৈহিক শ্রম। আমাদের কলকারখানার ডিরেক্টর ও তাদের সহকারী, মুখ্য প্রকৌশলী, কলঘর ও বিভাগসমূহের প্রধানদের মধ্যে নারীরা হচ্ছেন ৩০ শতাংশ।

এবারে ঘরে বসে কাজ করা প্রসঙ্গে।

কোনো কারণে নারীদের কেউ কারখানায় গিয়ে কাজ করতে না পারলে তাকে সুযোগ দেয়া হয় বাড়িতে কাজ করার। কোন কাজ কীভাবে করতে হবে তা কারখানাই নির্ধারণ করে। সেখান থেকেই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় প্রয়োজনীয় সব উপকরণ, যন্ত্র সরঞ্জাম। অবস্থা বিশেষে কারখানার লোকেরা দায়িত্ব নেয় এসব বাসায় পৌঁছে দেবার এবং তৈরি কাজ বাসা থেকে নিয়ে যাবার। নারীদের জন্যে এমন কাজ বেশ সুবিধার: কাজের দিনের শুরু কিংবা শেষ কখন তার বাধ্যবাধকতা নেই, ইচ্ছে মতো ব্যবহার করা যায় নিজের সময়, সুযোগ করে নেয়া যায় সংসারের কাজ ও ছেলেমেয়েকে দেখাশোনার।

ঘরে কাজ করলে তার মজুরি কেমন? এখানে স্থায়ী কোনো বেতন নেই। মজুরি হয় যে পরিমাণ কাজ তৈরি তার উপর পূর্ব নির্ধারিত ঠিকার হারে। প্রকৃতপক্ষে মজুরি নির্ভর করছে কর্মীর পেশাগত দক্ষতা, শ্রমের উৎপাদনী ক্ষমতা ও কাজের সময়ের উপর।

ঘরে বসে যারা কাজ করে তারা কারখানার আর সকলের মতোই পূর্ণাঙ্গ অধিকারী কর্মী। উৎপাদনের উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে তাল রেখে উন্নত মানের প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয় তাদেরও কাজে। তাদের জন্যে আয়োজিত হয় পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কোর্স, প্রয়োজনে ইনস্ট্রাক্টররা আসে তাদের বাড়িতে।

শ্রমাধিকারের ক্ষেত্রে বাড়িতে যারা কাজ করে তারা আর সব মেহনতীদের সঙ্গে সমপর্যায়ী। তারাও পায় সবেতন বার্ষিক ছুটি। সাময়িকভাবে শ্রমক্ষমতা হারালে ভাতা পায় সামাজিক বীমার তহবিল থেকে। কাজের মেয়াদ হিসাবের বেলাতেও কারখানার কর্মীদের মতো একই বিচার তাদের। একই রকম ভোগ করে তারা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা।

আমাদের দেশে ঘরে বসে কাজ করে সাধারণত পেন্সনধারী ও স্বল্প শ্রমক্ষমতার লোকেরা। যে সব শাখায় তাদের সংখ্যা বেশি সেগুলি হচ্ছে ব্যাপক ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও স্যুভেনির ইত্যাদির কুটিরশিল্প।

সোভিয়েত ইউনিয়নে চাকুরিতে নিয়োজিতা জননীরা কী কী সুযোগ সুবিধা পায় সরকার থেকে?
দীপক রাস্তোগি (ভারত)

সম্পাদনালয়ের অনুরোধে এ প্রশ্নটির উত্তর দিচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের আইন বিভাগের প্রধান **ভ. ভ. ক্লেপৎসোভ:**

এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী বহু বিভিন্ন দেশের পাঠক-পাঠিকা। একাধিকবার এ প্রশ্নটির উত্তর আমাকে দিতে হয়েছে অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অংশীদের, এ প্রসঙ্গে বলেছি বিভিন্ন দেশের ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে আলাপে। এখানে একটি তথ্য দিয়ে শুরু করতে চাই: বর্তমানে আমাদের দেশের কর্মক্ষম নারীদের শতকরা ৯৩ জন চাকুরি অথবা লেখাপড়া করে। সামাজিক জীবনে সোভিয়েত নারীদের এমন সক্রিয়তার উৎস কোথায়? শ্রম ও শিক্ষাজীবনে তাদের এমন ব্যাপক অংশগ্রহণেরই বা সুযোগ কীসের দৌলতে। প্রথম কারণ নিঃসন্দেহে আমাদের দীর্ঘদিনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা জীবনের সবক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার। এবং অবশ্যই, মাতৃত্বের পাশাপাশি শ্রম ও শিক্ষা চালনায় সহযোগী সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার প্রাচুর্য। লেনিন বলেছিলেন, নারী ও পুরুষের সাম্য বলতে তাদের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা, পরিমাণ, সময় কিংবা শর্তাবলি টাই টাই সমান হবে তা বোঝায় না।

সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরগুলিতেই গ্রহণ করা হয়েছিল চাকুরিরতা জননী নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ডিক্রি!

নির্ধারিত হয়েছিল তাদের কাজের পরিমাণ, সীমিত মাত্রায় নেমে আনা হয়েছিল অতিরিক্ত সময়ের খাটুনি, নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মাটির তলায় তাদের কাজ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাদের নৈশশ্রম। ভাবী মায়েদের জন্য চালু হয়েছিল গর্ভধারণ ও প্রসূতি ভাতা দেবার নিয়ম।

এখন সন্তানসম্ভবা নারীরা চাকুরির মেয়াদ নির্বিশেষে প্রসবের আগে ও পরে পুরো বেতনসহ ১১২ দিনের ছুটি পায়। জটিল প্রসবের বেলায়, আর দুই কিংবা ততোধিক জমজ শিশুর জন্ম হলে সবেতন ছুটি আরও দু'সপ্তাহ বাড়িয়ে দেয়া হয়।

সন্তান জন্মের অনেক আগে থেকেই ভাবী মাতার স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয় সরকার। চিকিৎসকের সুপারিশ অনুযায়ী গর্ভবতী নারীকে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজে বদলি করা হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি হয় না ভাবী মাতার, কেননা বজায় রাখা হয় তার পূর্ব সমতুল্য গড় মাসিক বেতন।

আমাদের শ্রম আইন গর্ভবতী নারীদের জন্যে আরও অনেক সুবিধা দেয়। বিধিগত সুযোগ সুবিধা পায় এক বছর পর্যন্ত বয়সী সন্তানের মায়েরাও। গর্ভবতী নারী কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতাকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের অধিকার কোনো সংস্থার নেই এখানে। কেউ

সোভিয়েত রাষ্ট্র পরিবারের প্রতি যত্ন নেয় কিভাবে?
নগুয়েন খই (ভিয়েতনাম)

আমাদের সংবাদদাতা জ. ইলিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন মন্ত্রকের প্রধান উপদেষ্টা **নিনা নিকোলস্কায়াকে।**

– প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবার সুদৃঢ়ীকরণ ও উঠতি পুরুষের প্রতিপালনের প্রতি যত্ন নিয়ে আসছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে লেখা আছে: 'পরিবার রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণের অধীনে'। তার অর্থ কী?

– পরিবার – আমাদের সমাজের প্রাথমিক কোষ, এখানে নাগরিকরা বজায় রাখে তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ। ১৯৭৭ সালে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান নির্ধারিত করেছে পরিবার গঠনের মূলমন্ত্র: 'বিবাহ টিকে থাকে নারী ও পুরুষের স্বেচ্ছামূলক সম্মতিতে; পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দম্পতি পুরোপুরি ভাবে সমাধিকারী'। পরিবারের রক্ষা ও দৃঢ়ীকরণ হল অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।

পরিবার সংরক্ষণের ধারণা অসাধারণ ভাবে ব্যাপক। এতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শিশু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও বিকাশের মাধ্যমে পরিবারকে ব্যাপক সহায়তাদান, দৈনন্দিন সেবা ও সামাজিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার গঠন ও উন্নতি, বহুসন্তানের পরিবারকে সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা, শিশু প্রসবের সময় আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি।

তাছাড়া এই ধারণায় অন্তর্ভুক্ত পারিবারিক জীবনযাত্রার নিয়মিত উন্নয়ন, নতুন ফ্ল্যাট, পারিবারিক বিশ্রাম ভবনের টিকিট, পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য আগ্রহোদ্দীপক সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ব্যবস্থা, বিনা মূল্যে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সবই।

পরিবার রক্ষার সুনিশ্চয়তা দেয় তার সদস্যদের, সর্বাগ্রে মাতা ও শিশুর স্বার্থের আইনসম্মত অধিকার। আমাদের দেশ মাতৃত্ব প্রধানতম সামাজিক কর্তব্য বলে বিবেচিত। শ্রম আইনের একাধিক ধারা রক্ষা করে· গর্ভবতী নারী, দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মাতা আর বহুসন্তানের জননীর স্বার্থ।

– দেশের সামাজিক বিকাশের সাধারণ ধারার আওতাভুক্ত সোভিয়েত পরিবারের প্রয়োজন সমাজের পক্ষ থেকে অনবরত প্রেরণা। এটা করা হয় কীভাবে?

– ১৯৮০ – ১৯৮৫ এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের প্রধান ধারাবলীর মাত্র কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করছি: 'নবদম্পতি এবং শিশু আছে এমন পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা বৃদ্ধি করা। এ পরিবারগুলির জন্য সুযোগ সুবিধা বিস্তার করে তোলা, তাদের আবাসিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নয়নে সাহায্য করা, শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি করা...'

সূত্রটিতে নিশ্চয় লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি ও নতুন পরিপ্রেক্ষিত...

এর অন্যথা করলে তার বিচার হয় ফৌজদারি আদালতে।

আমাদের দেশে চাকুরিরতা জননীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৬শ কংগ্রেসেও তা প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস সমাপ্তির অব্যবহিত পরে পরেই সন্তান-সন্ততি আছে এমন পরিবারদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনামা গ্রহণ করা হয়। এখন তার বাস্তবায়ন চলছে পূর্ণ সক্রিয়তায়। গত বছর থেকে চালু নিয়মানুযায়ী চাকুরিরতা ও নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরতা তরুণী মায়েরা শিশুর এক বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া অবধি আংশিক বেতনসহ ছুটি পাচ্ছে। এমন ছুটি তারা আগেও পেত তবে বেতন ছাড়া। এখন দূর প্রাচ্য, সাইবেরিয়া ও দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকার এ ধরনের মেয়েরা বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ পায় এই ছুটির সময়ে। অন্যান্য এলাকার মেয়েদের দেয়া হয় মাসিক ৩৫ রুবল।

কচি সন্তানের মায়েরা ইচ্ছা করলে শিশুর দেড় বছর বয়স হওয়া অবধি ছুটিতে থাকতে পারে। তবে অতিরিক্ত ছ'মাসের ছুটির সময়ে তাকে কোনো বেতন দেয়া হবে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই: আগের মতোই এখনও উপরে বর্ণিত ছুটির সময়টি চাকুরির মেয়াদে গণ্য করা হয়। বজায় থাকে চাকুরিতে তার পদও। আর বারো বছর বয়স অবধি দুই কিংবা ততোধিক সন্তান কেউ পালন করলে তার জন্যে অতিরিক্ত তিন দিনের সবেতন ছুটির নিয়মটি জননী নারীর শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেরই প্রতীক। এমনি মাতারা ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার জন্যে বেতন ছাড়া অতিরিক্ত দু'সপ্তাহ ছুটি পেতে পারে। পাঁচ কিংবা ততোধিক সন্তানের মা হলে মেয়াদ পূরণের অনেক আগেই পেন্সনে যাবার অধিকার আছে তার।

আরো দু'টো বিষয়ের কথা বলতে চাই। গত বছর থেকে চালু নিয়ম মতে প্রথম সন্তানের জন্মমুহূর্তে তরুণী মাতা এককালীন ৫০ রুবল আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের জন্মমুহূর্তে ১০০ রুবল করে বিশেষ ভাতা পাবে। স্বামী না থাকলে প্রতিটি সন্তানের ১৬ বছর পূর্ণ হওয়া অবধি মাসে ২০ রুবল হারে ভাতা পাবে প্রতি জননী। আগে এই ভাতার পরিমাণ এর চেয়ে কম ছিল।

সন্তান-সন্ততি আছে এমন পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলি নির্ধারণে সক্রিয়তম অংশগ্রহণ করে সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাসমূহ। এসব ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ বাস্তবায়নই এখন আমাদের দায়িত্ব।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কি এমন ব্যবস্থা আছে যাতে প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধ নারীরা ভাতা পেতে পারে? পেন্সন পাবার সুযোগ আছে কি তাদের?
রাজ কুমার বর্ম (ভারত)

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের দেশের প্রতিটি মেহনতী মানুষই বৃদ্ধ বয়সে পেন্সন পাবার অধিকারী।

পুরুষদের জন্যে পেন্সন প্রাপ্তির বয়স ৬০ বছর, নারীদের – ৫৫ বছর। আর কর্মজীবনে শেষে এই পেন্সন পাবার জন্যে চাকুরি আমলে কাউকে বেতনের কোনো অংশ চাঁদা কিংবা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কিস্তি হিশেবে দিতে হয় না। পেন্সন বাবদ সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করে তার নিজস্ব তহবিল থেকে।

পেন্সন পাবার জন্য নারীদের চাকুরির সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে ২০ বছর। বহু সন্তানের মায়েরা ভোগ করেন বিশেষ সুবিধা। পাঁচ কিংবা তদোধিক সন্তানের জননীরা নিজে ছেলেমেয়েদের ৮ বছর বয়স পর্যন্ত দেখাশোনা করলে পেন্সন পেতে পারেন ৫০ বছর বয়সেই। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের চাকুরির মেয়াদ হতে হবে কমপক্ষে ১৫ বছর।

এখানে অবশ্যি এমন নিয়ম নেই যে নারীদের অবশ্যই চাকুরি করতে হবে পেন্সনের বয়স পর্যন্ত। চাকুরির মেয়াদানুযায়ী পেন্সনের সময় এলে তাঁরা অবসর নিতে পারেন। তবে পেন্সন পাওয়া শুরু হবে নিজে যখন তৎসমন্বয়ী বয়সে পা দেবেন খতন থেকে।

পেন্সনের পরিমাণ হচ্ছে অবস্থা বিশেষে বেতনের শতকরা পঞ্চাশ থেকে একশ' ভাগ। বেতন যত কম শতকরা হারে তত বেশি পরিমাণ হিসাব করা হয় এ পেন্সন।

পেন্সনের বয়স পুরলেই চাকুরি ছেড়ে দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই আমাদের দেশে। পেন্সনপ্রাপ্ত লোকেদের সাধ্যানুযায়ী আরও চাকুরি করার সুযোগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সমাজ ব্যবহার করে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। তাছাড়া শ্রমিক, সেবাক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মী, ফোরম্যান, সর্ব পর্যায়ের চিকিৎসাকর্মী ও পল্লী অঞ্চলের স্কুলশিক্ষকেরা যদি পেন্সনের উপযোগী বয়সেও চাকুরি করেন তাহলে আগের মতোই সম্পূর্ণ বেতন পান।

পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে শহীদদের বিধবা স্ত্রীরাও পেন্সন পান। আর এ ক্ষেত্রে তাঁরা কতদিন চাকুরি করেছেন কিংবা কোন বয়সে পঙ্গু হয়েছেন সেসব মোটেই ধরা হয় না হিসাবে।

মাতৃভূমি, তাজিকিস্তানের সবাই তাঁকে শুধু গুলরুখসোর নামেই ডাকে। অন্যত্র তাঁর পুরো পরিচয় – গুলরুখসোর সাফিয়েভা।

মাতৃভূমির জীবন্ত প্রস্রবণের অনুপ্রেরণায় পোষিত কিংবদন্তীসুলভ খ্যাতির কবি তিনি।

কবিতার বাস্তব সজীবতা, ছন্দের অনুপ্রেরণা তাঁর কাছে এসেছে পাহাড়ী নদী ইয়াখচের খরস্রোত ভেসে। তারই তীরে জন্ম গুলরুখসোরের, মানুষ হয়েছেন পাহাড়ী এলাকার অকৃপণ আলো হাওয়ায়।

...ইয়াখ্‌চ, তোমায় ফের মনে পড়ে হৃদয় উৎলা হয়ে,
জীবন, শস্য, মানুষের দিকে একই পথ গেছে চলে।
শস্যের গোলা একটি সেখানে একই নদী গেছে বয়ে,
শিশুর মনেও উৎসব, শোক একই ঝংকার তোলে।

গুলরুখসোরের বাবা এখনও বাস করেন গ্রামে। প্রতিবছরই তিনি যান তাঁর কাছে। বেশ কিছু দিন সেখানে থেকে যেন শক্তি ও প্রেরণা নিয়ে যান নতুন কর্মোদ্যমের। তবে একা আসেন না। সঙ্গে নিয়ে আসেন ছেলে আজিজকে। ইচ্ছা, যেন নাগরিক পরিবেশে মানুষ তাঁর সন্তান দীক্ষা পায় দেশের মাটির। একসময় গুলরুখসোর নিজে মাতৃভূমির মহত্বকে তুলনা করতেন তাঁদের পল্লীর নিকটতম সবচেয়ে উঁচু মানোর পাহাড়টির সঙ্গে। তখন তিনি জানতেন না যে তার পেছনে মাথা তুলে আছে বড়ো বড়ো আরও অনেক পাহাড়, আছে তাঁর পরিচিত স্থানটির চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বড়ো বিশাল জগৎ...

গুলরুখসোর তখনও অল্পবয়সী মেয়ে। মা মারা যান ছোটো বোন জন্মের কিছু পরে পরেই। সংসারের জটিল দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন বাবা। তাঁরা দু'জনে মানুষ করেন ছোটো বোনকে, চেষ্টা করেন যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বাড়ি, কখনও টান না পড়ে খাওয়া পরায়। এভাবেই অনেক ক'বছর কেটে যায়... এখন গুলরুখসোরের নিজস্ব বাড়ি আছে, স্বামী নেগমত আর এক ছেলের নিজস্ব পরিবার। নেগমত – ভূতত্ত্ববিদ, প্রতিবছর ভূতাত্ত্বিক অভিযানে যান
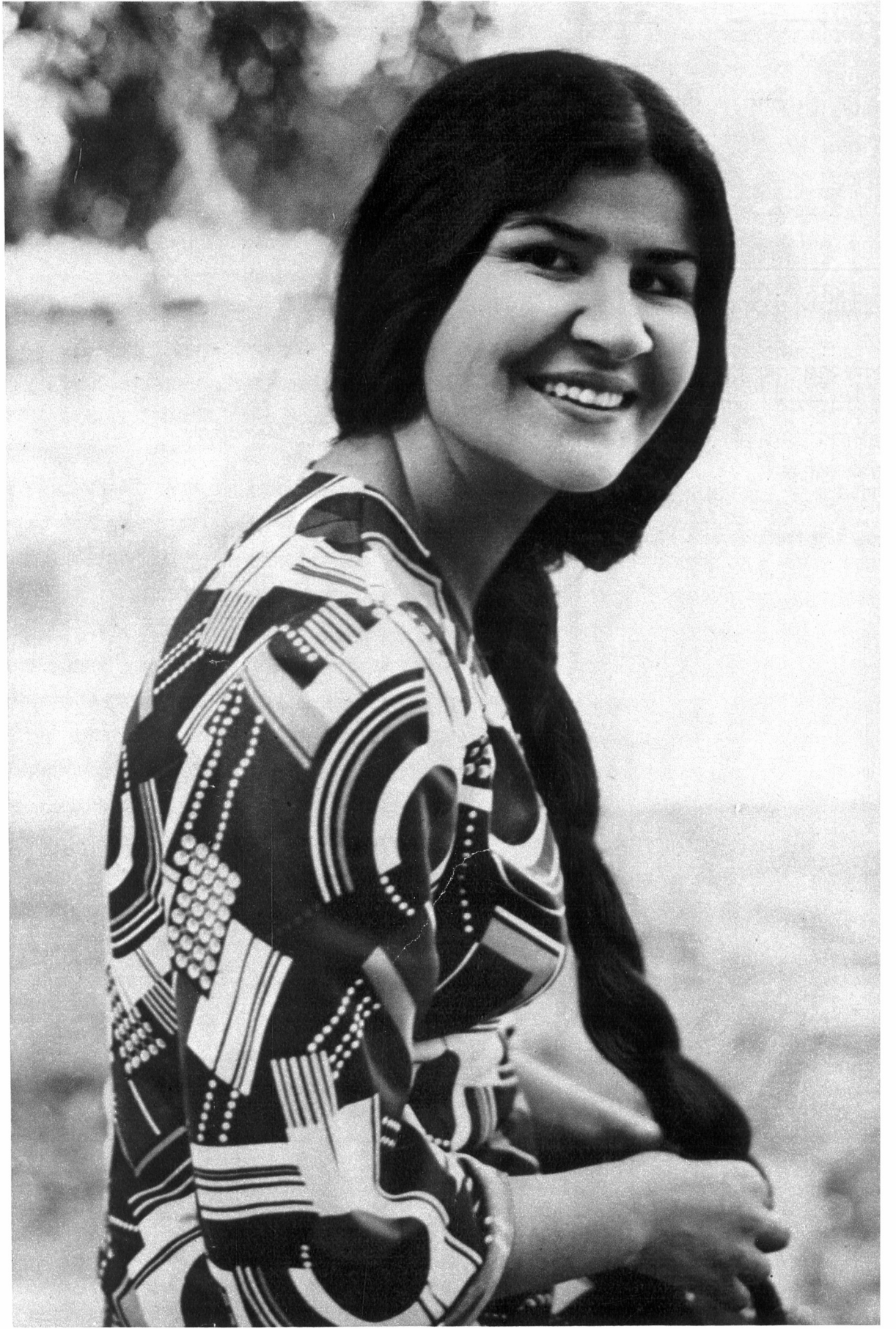
দেশের নিয়তি মানে আমারই নিয়তি

প্রস্রবণ নয়– কবিতা
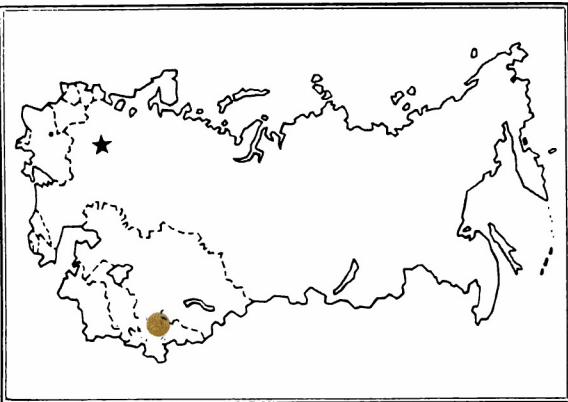
পামিরে। বাড়িতে পুরো সময় তিনি উৎসর্গ করেন স্ত্রী ও ছেলেকে।

গুলরুখসোর মেধায় অনন্যা: তাঁর কাব্যক্ষমতা সমন্বিত সঙ্গীত প্রতিভার সঙ্গে, তিনি চমৎকার গান গান, নাচেনও, পারেন দোতারা বাজাতে।

গুলরুখসোর মানুষ হয়েছেন সোভিয়েত আমলে। তাঁকে কখনও বোরখা পরতে হয় নি। স্বাধীন ভূমিতে তিনি বাস করেন আর সবার মতো সমান অধিকার নিয়ে।

জন্ম তাঁর তাজিক নারীর গর্ভে, মানুষ করেছে মাতৃভূমি, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, নিষ্কলুষ মন ও সহৃদয়তার দীক্ষায় তাঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে কমসোমল। এই সব গুণ গুলরুখসোরকে প্রচুর সহায়তা করেছিল কমসোমলে তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে। তিনি ছিলেন একাধারে তাজিকিস্তানের লেনিনীয় কমসোমলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা, প্রজাতান্ত্রিক শিশু পত্রিকা 'পাইওনিয়ার' ও 'মশাল' এর প্রধান সম্পাদিকা। গত বছর তাজিকিস্তানের সাহিত্যিকেরা তাঁকে নির্বাচন করেছেন প্রজাতন্ত্রের লেখক সঙ্ঘ পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকরী পরিষদে। দুশানবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব অনুষদের স্নাতক, ফারসী ভাষায় বিশেষজ্ঞ, গুলরুখসোর অর্জন করেছেন স্বদেশবাসীদের প্রেম ও সম্মান।

কমসোমলে সাগ্রহে প্রচুর কাজ করেও গুলরুখসোর কবিতা লেখার সময় পান। তাঁর দশটিরও বেশি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাজিক ভাষায়। রুশ ভাষায় তাঁর রচনা অনুবাদ করেন বিশিষ্ট দুই কবি রিম্মা কাজাকোভা ও তাতিয়ানা কুজোভলেভা। তাঁদের প্রতিভাশীল অনুবাদে উপলব্ধ হয় গুলরুখসোরের কবিতার জীবন্ত হৃৎস্পন্দন।

মাতৃভূমি, জীবন-মৃত্যু, প্রেম, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এসব নিয়ে অনেক কবিতা লেখেন গুলরুখসোর। তার সব ছত্র হালকা রঙে রঞ্জিত, পরিতৃপ্ত তাঁর স্নেহে। বর্তমানে তিনি 'আফগানিস্তান – বেদনা আমার' নামে নতুন বইয়ের ওপর কাজ করছেন। এটি তিনি লিখতে শুরু করেছেন সে দেশ সফরের পর। বিশ্বের উদ্বেগ-ঘটনাবলীতে অনুদাসীনা, আফগান জনগণের যন্ত্রণা প্রতি মনেপ্রাণে সংবেদনশীলা গুলরুখসোর খুঁজে পেয়েছেন এমন কথা, যাতে প্রকাশ পেয়েছে পরিপার্শ্বিকতার প্রতি তাঁর সম্পর্ক, তাঁর দৃঢ় আশ্বাস: সত্য ও ন্যায় জয়ী হবে আফগানিস্তানের ভূমিতে।

শান্তির ভাবনা গুলরুখসোরকে কখনও কোথাও ত্যাগ করে না। ইয়াখ্চেও তাই: সেখানে আজও ঘরের দুয়ার খোলা রেখে বৃদ্ধা আমিনা অপেক্ষা করছে কবে তার একমাত্র ছেলে ফিরবে যুদ্ধ থেকে। সে ফ্রন্টে গিয়েছিল তার বিয়ের মাত্র তিন দিন পর, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই। গ্রাম থেকে আরও যারা যারা গিয়েছিল তাদের সকলকে সে অনুরোধ করে ছেলের খবর দেয়ার জন্য। আজ পর্যন্ত কেউই দিতে পারে নি তার কোনো খোঁজ। বৃদ্ধা আমিনার প্রতীক্ষা পরিণত হচ্ছে গুলরুখসোরের কবিতার ছন্দে...

গুলরুখসোরকে তাজিকিস্তানের আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই জানে। এটা কোনো অত্যুক্তি নয়। পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে তাঁর অসংখ্য মিলনসভার একটির কথা বলাই যথেষ্ট।

একবার কবি গিয়েছিলেন পাহাড়ী কুলাব অঞ্চলে। সে ছিল বসন্ত কাল – চাষীদের প্রচুর কাজ তখন। এ অঞ্চলের পাথুরে ও জলবিহীন জমিতে চাষীর শ্রম অসাধারণ কঠিন। কিন্তু জমি তার প্রতি মানুষের বিশ্বস্ততার জন্য সর্বদাই বদান্য। কুলাব এখন সূক্ষ্মতম কাপড় প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত শ্রেষ্ঠ মানের লম্বা আঁশের তুলো উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

প্রজাতান্ত্রিক সৌখিন শিল্পীদলের কন্সার্ট।

এই অঞ্চলেরই লোকেদের সামনে নিজের কবিতা আবৃত্তি করেন গুলরুখসোর। তিলধারণের ঠাঁই ছিল না হলঘরে। দরজায়ও জাম করে দাঁড়িয়ে ছিল লোক, শ্বাস বন্ধ করে তারা শুনছিল গুলরুখসোরের কবিতা। সে কবিতা তাঁর ক্লান্তিহীন স্বরে গানের মতো ভেসে যাচ্ছিল শ্রোতৃসমুদ্রে...

অবশেষে কবি শ্রান্ত হয়ে এলে একের পর এক মঞ্চে উঠতে থাকে স্বয়ং শ্রোতারা, আবেগে তারা আবৃত্তি করে যায় কবির পাঠ না করা কবিতা। মনে হচ্ছিল যেন হলঘরের সবাই মুখস্থ জানে তাঁর সমস্ত রচনা।

গুলরুখসোর প্রায়ই বিভিন্ন স্থান সফরে যান। সোভিয়েত সব প্রজাতন্ত্রে তো বটেই, বিদেশেও তিনি বিখ্যাত। মির্জো তুর্সুন-জাদে, রসুল হামজাতভ, চিঙ্গিজ আইতমাতোভ, বোহী রহিম ও সাম্প্রতিকতার অন্যান্য বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে মৈত্রী তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। প্রচুর কাজ সত্ত্বেও গুলরুখসোর প্রতিবছর বসন্তে রঙ্গলীলা লাস্যময়ী মাতৃভূমির সাথে মিলনের জন্য ইয়াখ্চে যাবার সময় করে নেন। সেখানে তৃপ্তি লভেন তার প্রস্রবণগুলির ঠাণ্ডা জলে, তাতেই অবগাহিত হয় তাঁর নিষ্কলুষ স্বচ্ছোজ্জ্বল কবিতা। সম্প্রতি নিজের একটি বইয়ের ভূমিকায় কবি লিখেছেন: 'মাতৃভূমির সূত্রপাত দোলনা-খাট থেকে আর কবির সৃজনা শুরু হয় স্বগৃহের চৌহদ্দীতে। আমার মহান দেশটিকে আমি ভালোবাসতে শিখেছি বাড়ির কারো নির্দেশ, কড়া উপদেশ ব্যতিরেকেই, আপনা থেকে হয়ে উঠেছি দেশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।'

ন. পাভলোভা

ফটো: ন. বেলেৎস্কি, ল. কালিনিনা, ব. পক্রোভস্কি, তাস

তাজিকস্তানের বিখ্যাত তুলা। * তাজিকস্তানের মাঠ ও বাগানে অমৃতসুধাময় পানি আসে ন্যুরেকের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র হতে। * বয়ন কারখানায়।

আমি শুনেছি যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এক্তিয়ারে কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র আছে। তাদের কি আসলেই নিজস্ব পতাকা ও সংবিধান, আলাদা কোর্ট-কাছারি আছে? এ ধরনের প্রজাতন্ত্রের সংখ্যাই বা কত?

অজয় কুমার (ভারত)

এ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমরা অনুরোধ করি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জাতিসমূহের পরিষদের সভাপতি ভ. প. রুবেনকে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র বলতে বোঝানো হচ্ছে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্য।

সোভিয়েত সংবিধানের ৮২ নং ধারায় লেখা আছে:

'স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র থাকবে সোভিয়েত অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের এক্তিয়ারে।

'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের সে অন্তর্ভুক্ত তার নির্ধারিত আইন কাঠামোর বাইরেও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি সমাধানে স্বাধীনতার অধিকারী।

'স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের থাকবে নিজস্ব সংবিধান, তবে তা সোভিয়েত অঙ্গ প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সামঞ্জসী হবে এবং তাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবেচনা থাকবে।'

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সংখ্যা মোট ২০টি। এসবের মধ্যে রুশ ফেডারেশনে আছে – বাশকিরিয়া, বুরিয়াতিয়া, দাগেস্তান, কাবার্দিনো-বালকার, কালমিকিয়া, কারেলিয়া, কোমি, মারি, মর্দোভিয়া, উত্তর ওসেতিয়া, তাতারিয়া, তুভা, উদমুর্তিয়া, চেচেনো-ইঙ্গুশেতিয়া, চুভাশিয়া ও ইয়াকুতিয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র। আজারবাইজানে – নাখিচেভান, জর্জিয়ায় – আবখাজিয়া ও আজারিয়া আর উজবেকিস্তানে– কারাকালপাক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব সর্বোচ্চ পরিচালনা সংস্থার নাম স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েত। এছাড়া তার আছে ক্ষমতা বণ্টন ও শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকারী সরকার, জাতীয় কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ববাহী নানা মন্ত্রণালয় আর বিধি বিধান বজায় রাখার উপযুক্ত বিভিন্ন সংস্থা।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের মত ব্যাতিরেকে তার ভৌগোলিক সীমানায় পরিবর্তন আনা যাবে না। নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের গঠন হতে পারে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের স্বীকৃতি সাপেক্ষে। স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র নিজের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ও ও সামাজিক উন্নয়নকর্ম পরিচালনা করে, ব্যবস্থা করে তার এলাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা বজায় রাখার, দেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়নের।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রটি যে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তার রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহ সমাধানে অংশ নেয় তাদের উচ্চ পর্যায়ী সংস্থাগুলিতে নিজের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জাতিসমূহের পরিষদে প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের অধিবাসীদের থেকে ১১ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় (সংবিধানের ১১০ নং ধারা)। ২০টি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের ২২০ জন প্রতিনিধি জাতিসমূহের পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার (৭৫০ জন) প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এছাড়া সর্বসাধারণ ভিত্তিতে, তথা লোকসংখ্যার কোটা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতেও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র থেকে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের এক্তিয়ারে দেয়া হয়েছে অঙ্গ প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতসমূহের এক্তিয়ার বহির্ভূত প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণের বহু ব্যাপক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ও অধিকার। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও প্রজাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীন কল-কারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের দায়িত্বও পালন করে স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।
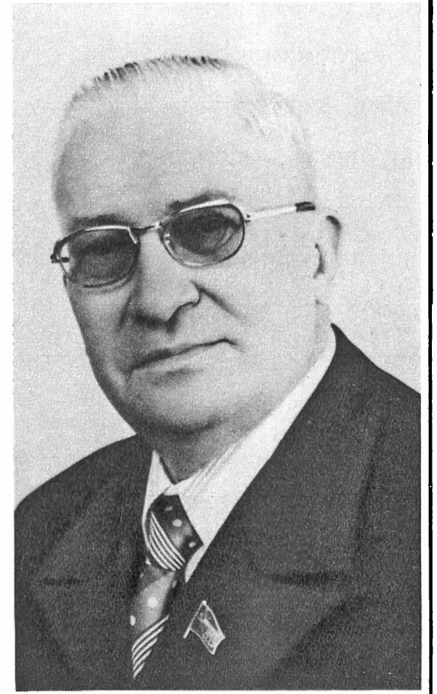
স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারায় নির্ধারিত তার নিজস্ব প্রতীক, পতাকা ও রাজধানী নগরী।

নারী সমাধিকারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের প্রথম পদক্ষেপ কীরকম ছিল?

লরেন্স তেম্পসেন বেম্নি (মোজাম্বিক)

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ায় সংঘটিত হয় মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, নিজ হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেয় মেহনতীরা।

সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনেই নারীরা অর্জন করে পুরুষদের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার, এটি লিপিবদ্ধ হয় প্রথমে সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তবলীতে, পরে– সংবিধানে।

নারীদের প্রকৃত অসাম্য অবসান করা ছিল তার চেয়ে অনেক কঠিন। কোটি কোটি নারী, বিশেষ করে রাশিয়ার প্রাচ্য অঞ্চলসমূহে, যেখানে নারীরা ছিল বিশেষভাবে অবহেলিত, অর্জিত অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করতে পারে নি কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার দরুণ।

মেহনতী নারীদের সামাজিক মুক্তিকরণের যে ব্যবস্থা লেনিন প্রবর্তন করেছিলেন তাকে নারী সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত লেনিনীয় কর্মসূচি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোটি কোটি নারীর মনে তাদের সামর্থ্য ও শক্তিতে আশ্বাস জাগানো আর তাদের নিরক্ষরতা, পেশাগত পশ্চাদপদতা, রাজনৈতিক জীবনের জন্য অপ্রস্তুতি দূর করতে সহায়তা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই সঙ্গে দরকার ছিল পূর্ণাধিকারী ব্যক্তিত্ব হিশেবে নারীর প্রতি কোটি কোটি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা। সামাজিক কার্যকলাপের সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ সমাধিকারের বাস্তবায়ন নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য, তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনার সঙ্গে সামঞ্জসী হওয়া উচিত। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে জারি হয় নতুন একটি ডিক্রি, যা অনুযায়ী মেহনতী নারীদের দেয়া হয় গর্ভাবস্থা সম্পর্কিত সবেতন ছুটি, কাজের সময় শিশুকে খাওয়ানোর বিরতি ইত্যাদির অধিকার। বিপ্লবোত্তর দ্বিতীয় বছরে নবীন রাষ্ট্র জারি করে মাতৃ ও শিশু মঙ্গল সেবা ব্যবস্থার ডিক্রি।

লেনিনীয় কর্মসূচির প্রধানতম ধারণা ছিল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে নারীসমাজকে আকর্ষণ। লেনিন লিখেছিলেন, 'নারীর সম্পূর্ণ মুক্তি ও পুরুষের সঙ্গে তার সাম্যের জন্য প্রয়োজন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রয়োজন সাধারণ উৎপাদনশীল শ্রমে নারীদের অংশগ্রহণ। এটা পুরুষের উপর নারীর আর্থিক নির্ভরশীলতা দূর করে তথা নারী-পুরুষের বাস্তব সাম্যের জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তির সুনিশ্চয়তা দেয়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মেহনতী নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ভর করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, সন্তান পালন আর গৃহস্থালীতে সামাজিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ওপর। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নারীদের অবস্থা অনায়াস করে এমন কিণ্ডারগার্টেন, শিশু সদন, ভোজনালয় প্রভৃতি ব্যবস্থিত হয় বিপ্লবোত্তর প্রথম বছরেই।

১৯১৮ সালের নভেম্বরে মস্কোয় আয়োজিত হয় শ্রমিকা ও কিষাণীদের প্রথম সর্বরাশিয়া কংগ্রেস, যা হয়ে উঠেছে নারীদের বাস্তব মুক্তি সংক্রান্ত পার্টির কার্যকর কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত।

সোভিয়েত সরকারের প্রথম বছরগুলির বাজেটের স্বল্পতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র শ্রমিকা ও কিষাণীদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ অর্থ মঞ্জুর করে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হলে তারা ভোগ করে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা। এই সমর্থন ও সাহায্যের ফলে নারীরা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও উৎপাদনী জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমানে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে।

আজ আমাদের জাতীয় আয়ের অর্ধেকাংশ উৎপাদিত হয় নারীদেরই হাতে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ অঙ্গ – সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে তাদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ। প্রতি তৃতীয় গবেষণা কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার – নারী, বিদ্যার্থীদের প্রায় অর্ধেক – নারী...

ভারত মহাসাগরে সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে এতো আগ্রহী কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? কী স্বার্থ সে উদ্ধার করতে চায় এখানে? – জানতে চেয়েছেন আমাদের ভারতীয় পাঠক শ্যামল কুমার দেববর্মন।

ভারত মহাসাগরে মার্কিন অভিসন্ধি

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঘটনাবলির প্রতি বিশ্বের ব্যাপক গণসমাজের গভীর মনোযোগ নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বিশাল মহাসাগর হয়ে আছে মার্কিন সামরিক নৌবহরের শক্তিশালী ঘাঁটি। তার সুনীল ঊর্মিমালা ভেদ করে অবাধ বিচরণ করছে পরমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত বিমান- ও রকেটবাহী পোত। নৌ- ও আকাশযুদ্ধের মহড়া চলছে অবিরত। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে স্থায়ীভাবে তৈরি করেছে তার অ্যাডভান্স ফোর্সের সামরিক ঘাঁটি। সমুদ্রদেশে অবতরণভূমি বানানো হয়েছে স্ট্র্যাটেজিক বি-৫২ বোমারু বিমানের, বিচরণ করছে 'পোলারিস' ও 'পসিডন' নামের ব্যালাস্টিক রকেটবাহী পরমাণবিক সাবমেরিন।

এ বছর পুরনো রকেট বদলিয়ে সেগুলিতে বসানো হচ্ছে 'ট্রাইডেণ্ট' জাতীয় অধিকতর শক্তিশালী নতুন নতুন রকেট।

সত্তর দশকের শেষের দিকে আমেরিকা ভারত মহাসাগরকে নিজের 'স্বার্থরক্ষার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা' ঘোষণা করে তার উপকূলেও সামরিক ঘাঁটি সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছে। গোটা এলাকায় পেণ্টাগনের প্রধান সামরিক ঘাঁটি বলতে যেটি পরিচিত তা অবস্থিত ডিয়েগো-গার্সিয়া দ্বীপে। ঐতিহাসিকভাবে দ্বীপটি মরিসাসের অন্তর্গত। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেন তা হস্তান্তরিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে। আর তা করা হয় মরিসাসকে স্বাধীনতাদানের প্রাক্কালে। 'ইজারা'র শর্তানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটিকে ব্যবহার করতে পারবে ২০১৬ সাল পর্যন্ত।

স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে ডিয়েগো-গার্সিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়াশিংটন তাকে ভারত মহাসাগরে পেণ্টাগনের প্রধান সামরিক ঘাঁটি বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারত মহাসাগরে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কী উদ্দেশ্য এ প্রশ্নটির উত্তর পেতে হলে ঘাঁটতে হবে বিগত কয়েক বছরের বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাস। ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে ইরানে সংঘটিত হয় শাহবিরোধী তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদের মদদ পেয়ে শাহ সরকার পারস্য উপসাগরে জমাদারের ভূমিকা পালন করছিল। কিন্তু তার পতন ঘটলে আমেরিকা তৈলসমৃদ্ধ ব্যাপক অঞ্চলে নিজের আধিপত্য সঙ্কোচনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। ইরান থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হয় মার্কিনী সামরিক উপদেষ্টাবর্গ ও সংশ্লিষ্ট সব লোক-জন। ইরান সরকার কোটি কোটি ডলারের মার্কিন অস্ত্রক্রয়ও সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। ফলে মারণাস্ত্র ব্যবসায়ীদেরও লোকসান হয় প্রচুর। ঘটনার এমন পট পরিবর্তন ওয়াশিংটনের মোটেই মনঃপূত হয় নি। বিগত দশকের সমাপ্তিপর্বে টহল ও ভীতি প্রদর্শনের লক্ষ্যে পারস্যোপসাগরের ইরানী উপকূল বরাবর আমেরিকা পাঠায় বিশাল সামরিক নৌবহর। তবে ইরানের জনগণকে সামরিক দাপট কিংবা অন্য কোনো হুমকিই ভয়ে কোণঠেসা করতে পারে নি।

১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে রোনাল্ড রীগ্যান ক্ষমতায় আসার পর আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে সামরিক ভীতি প্রদর্শন আর উত্তেজনা বৃদ্ধিকরণের নীতি আরও জোরদার হয়। বিদেশী পত্র-পত্রিকার খবরানুযায়ী ভারত মহাসাগরে মার্কিন সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়াশিংটন আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ২৫০০ কোটি ডলার ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমেরিকার কী লাভ এতে?

ভারত মহাসাগর-তীরের এলাকাটি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদে: ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সন্ধানপ্রাপ্ত মোট ইউরেনিয়াম ও তৈল সম্পদের ৬৫ শতাংশ ও অর্ধেক সোনা কেন্দ্রীভূত এ অঞ্চলের খনিতে, আছে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য খনিজ পদার্থ। এ এলাকায় মার্কিন ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের কর্পোরেশনের মালিকানা কয়েক শ' কোটি ডলার।

খুবই স্বাভাবিক যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের বহু দেশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, একচেটিয়া পুঁজিবাদী সংস্থা ও বিভিন্ন পুঁজি বিনিয়োগী গ্রুপের লক্ষ্যাবলি চরিত্রগতভাবে পারস্যোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী সকল জাতির স্বার্থের পরিপন্থী। আফ্রো-এশীয় দেশসমূহ চায় যাতে ভারত মহাসাগরে সর্বদাই শান্তি বিরাজ করে, যেন তাদের আকাশে বিচরণ না করে আমেরিকার বোমারু বিমান, যেন পরমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার না হয় তারা কেউ।

এ বছর শান্তিপ্রিয় ভারতের রাজধানী দিল্লীতে 'ভারত মহাসাগর – শান্তির এলাকা' নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার উদ্যোক্তা ছিল বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থা। তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন পঞ্চাশটির বেশি দেশ ও দশটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি।

সম্মেলনের অংশীদের অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ। তাতে বলা ছিল: 'এমন এক পরিস্থিতিতে আপনাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী শক্তিবর্গ বিশ্বে উত্তেজনা বাড়িয়ে চলছে, প্রয়াস চালাচ্ছে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামী আন্দোলনগুলিকে দমনের। সাম্রাজ্যবাদী মহল বাড়িয়ে চলছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অজুহাত দেখাচ্ছে পরমাণবিক যুদ্ধের 'যৌক্তিকতার', নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করছে স্বাধীন অনেক দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে। ভারত মহাসাগরেও বিপজ্জনক স্ট্র্যাটেজি চালাচ্ছে তারা। তার উপকূল ঘিরে নানা দেশে এখন বাস করছে বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মানুষ... নিজেদের নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত মহাসাগরীয় দেশসমূহের লোকেদের উদ্বেগ একান্তই যুক্তিযুক্ত। এ ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে হুমকি আসছে আমাদের ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের নিরাপত্তার উপরে। ঘটনা বিবর্তনের ধারা আমাদের সবাইকে ভাবতে বাধ্য করে কীভাবে বর্ধিষ্ণু হুমকির পথরোধ করা যায় তা নিয়ে।'

সম্মেলনের অংশীরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে তাঁরা ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকায় পরিণত করার জাতিসংঘ সিদ্ধান্তের সপক্ষে।

এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী সব জাতিই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন শান্তিপূর্ণ জীবনের অধিকার, সন্তান-সন্ততির সুখী ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা সংরক্ষণের অধিকারে।

আ. বেলুস্কি

আপনাদের দেশের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের লৌকিক আচারানুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী আমরা।

মার্তা আদান বারিওস,
কাতালিনা কার্দোনা ওর্তা
(কিউবা)

একই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল ভারতের চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত পাঠক সম্মেলনে।

প্রিয় পাঠকবর্গ, বেশ কিছুদিন ধরে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির লৌকিক উৎসব ও আচারানুষ্ঠান নিয়ে লেখা প্রকাশ করে আসছি। এখন থেকে এই প্রসঙ্গে একটি নিয়মিত বিভাগ খোলা হবে। তাতে পরিচয় পাবেন অতি প্রাচীন, আধুনিক আমলের সব লৌকিক উৎসব, ও রীতির বিবরণী।

সরোচিন্‌সিতে উৎসব

পলতাভা অঞ্চলের এক গ্রাম ভেলিকিয়ে সরোচিন্‌সি। বাঁধানো পাকা রাস্তা, সবুজ গাছপালা, সুনির্মিত শ্বেত দালান-কোঠা, আধুনিক দোকান-পাট, সংস্কৃতি সদন সব মিলে খুবই সুন্দর তা। আছে ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যের কর্ণধার নিকোলাই গগোলের নামাঙ্কিত মিউজিয়াম।

প্রতি বছর সূর্যমুখী ফুল নেতিয়ে পড়ার মরশুম এলে, যখন নাকি চপলা স্রোতস্বিনী প্‌সিওলের পাড় ঘেঁষা উইলো সারির পাতায় পাতায় লেগে যায় হলুদের খেলা, গ্রামে ধুম পড়ে অতিথি বরণের। আজ কয়েক যুগ ধরে চলে আসছে এ উৎসব উদযাপন – সরোচিন্‌সি মেলা তার নাম।

'সরোচিন্‌সিতে যে রাস্তা গেছে তাতে মেলার জায়গা থেকে মাইল দশেক দূর অবধি লোকে লোকারণ্য। আশেপাশের তো বটেই, দূরান্তরের গ্রাম জনপদ থেকে সবাই চলছে মেলায়' – লিখেছেন ন. গগোল। আজও মেলার সময় এমনি ভীড় এ রাস্তায়। তবে যতোটা লোকের কলকোলাহল তার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রযানের ভেঁপু, গাড়ির চাকার গোঙানি। মেলায় শুধু প্রতিবেশি লোকজনই নয়, উপহারের ডালা নিয়ে আসে

ইউক্রেনের সব শহরেরই লোক। আসে পার্শ্ববর্তী প্রজাতন্ত্র, এমনকি আরও দূরের জায়গা থেকে। সবাই এখানে আসে কাজ নিয়ে: কেউ বিক্রির লক্ষ্যে, কেউ কিনতে, কেউবা শুধুই আনন্দের অংশী হতে।

মেলা সরগরম হয়ে পড়ে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই। যেদিকে তাকান দেখবেন তরমুজের পাহাড়, কিংবা আপেল, প্লাম, নাশপাতি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, রসুন, বেগুন আরও কতো কি! ইচ্ছে মতো যা খুশি কিনতে পারেন এখানে। নাকি এসবে মনোযোগ নেই আপনার? রঙীন টেলিভিশন কিনতে চান? নতুন ফ্ল্যাটে ওঠার আগে আসবাবপত্র বেছে কেনাও কঠিন কোনো কাজ নয় এখানে। নাকি পছন্দসই পোশাক কেনার শখ আপনার? ভালো কথা, কস্ট্যুম বলেন, ফ্রক বলেন যে কোনো রুচির সেট আছে আপনার পছন্দের অপেক্ষায়। আছে লৌকিক সূচিকর্মেরও নমুনা। জানেন নিশ্চয়ই, এখানের সূচিকর্ম পরিচিত বিশ্বের বহু দেশে। এদিক

ওদিক ঘোরাফেরা করুন মেলায়, হঠাৎ দেখবেন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে বসেই কেউ বিক্রি করছে জ্যান্ত হাঁস...

দুপুর বেলা ঠিক যেন কারও আদেশ মেনে মেলার মাঝখানে দাঁড়ানো ছোট্ট এক বাড়ির উঠোনের বেড়া ঘিরে জমা হয় সব লোক। গগোলের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে তাদের দেখা হবে এখনই। একটু পরেই বেরিয়ে আসে খোলা কয়েকটি গরুর গাড়ি। আর সেগুলিতে – হিবরিয়া, সলোপি, চেরেভিক, পারাসিয়া, গ্রিৎস্কো, সলোখা, দিয়াক – গগোলের নানা উপাখ্যানের সব চরিত্র। একি, স্বয়ং গগোলও দেখি তাদের মাঝে! মৌমাছি পালক রুদি পানকোর পাশে গাড়িতে বসে তিনি লিখে নিচ্ছেন তার বিচিত্র সব গল্প!

মেলার উৎসব, সরগরম গানবাজনায় ভর সন্ধ্যা অবধি ব্যস্ত থাকে সরোচিন্সি, অতি প্রাচীন, আজও নবীন এই পল্লী।

ই. কনস্তান্তিনোভ

ফটো: লেখক ও আ. মিলোভস্কি

স্নাতকোত্তর কোর্স সম্বন্ধে জানতে চাই, কারা এতে ভর্তি হতে পারে, মেয়েরা এ কোর্সে পড়ে কি না?
সোনিয়া সালগাদো (কিউবা প্রজাতন্ত্র)

আমাদের দেশে দু' ধরনের স্নাতকোত্তর কোর্স আছে: সোজাসুজি তিন বছরের কোর্স, এতে ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়সের তরুণ বিশেষজ্ঞদের ভর্তি করা হয়, এবং করেসপণ্ডেন্স কোর্স – চার বছরের, যে ক্ষেত্রে বয়স ৪৫ বছরের বেশি হলে চলবে না। স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হতে পারে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে সবচেয়ে প্রতিভাশালী ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনকারী পাশ করা ছাত্ররা, যাদের নাম উচ্চশিক্ষায়তনের বা অনুষদের বিজ্ঞানী পরিষদ সুপারিশ করে, তাছাড়া বিজ্ঞানের যে-কোন ক্ষেত্রে অন্তত-পক্ষে দু'বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে জাতীয় অর্থনীতির এমন বিশেষজ্ঞদের স্নাতকোত্তর কোর্সে আমন্ত্রণ জানানো হয়। স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হবার জন্য নিজের পেশা বিষয়ে, বিদেশী ভাষা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের জ্ঞান নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। তিন বছরের গবেষণা কালে স্নাতকোত্তর গবেষককে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক থিসিস লিখতে হয়। থিসিস সমর্থনের আগে বিশেষ কমিশনের কাছে স্নাতকোত্তর গবেষককে নিম্নতম জরুরী জ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা দিতে হয়।

উচ্চশিক্ষায়তন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইনস্টিটিউটে যত স্নাতকোত্তর গবেষক আছে তাদের প্রায় ২৯ শতাংশই নারী।

আপনাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের দাম কেমন?
বাসা ভাড়া ও পরিবহন খরচারই পরিমাণ কত?
পর্তুগালের বারেইরুতে অনুষ্ঠিত পাঠক সম্মেলনে দেয় প্রশ্নাবলী থেকে

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার আগের মতোই আজও প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচনা করে সোভিয়েত জনগণের বৈষয়িক সচ্ছলতার মানোন্নয়ন। সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া হয় খাদ্য ও বাসস্থান সংক্রান্ত বিষয়াদিতে, চাকুরিতে ও বাসগৃহে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি আর পন্য সরবরাহ ও সেবাব্যবস্থার উন্নয়নে। শুধুমাত্র চলতি একাদশ পাঁচসালার ক'বছরেই আমাদের মেহনতী লোকেদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাবে ১৬-১৮ শতাংশ। শ্রমিক ও চাকুরিজীবিদের গড় মাসিক বেতন বৃদ্ধি পাবে ১৩-১৬ শতাংশ, কৃষিখামারীদের – ২০-২২ শতাংশ। প্রকৃত আয় যে কারণে বাড়বে তা হচ্ছে প্রধান প্রধান খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পসামগ্রীর রাষ্ট্র নির্ধারিত খুচরা মূল্য, বাড়ি ভাড়া ও পৌরসেবার বিল এবং পৌর পরিবহনের ভাড়া অপরিবর্তনীয় রাখার নীতি। এটা সোভিয়েত সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ফ্ল্যাটের তাপ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিল এখন যে হারে দিতে হয় তা নির্ধারিত হয়েছিল আজ ত্রিশ বছর আগে। সামাজিক পরিবহণ ভাড়াও অপরিবর্তনীয় আছে বহু বছর ধরে। যে কোনো রুটে যে কোনো দূরত্বের জন্যে একবার উঠলে ভূগর্ভ রেল ও বাসের ক্ষেত্রে ৫ কোপেক, ট্রলিবাসের – ৪ কোপেক, ট্রামের – ৩ কোপেক।

শতকরা ৯৫টি খাদ্য পণ্য ও শতকরা ৯০টিরও বেশি নিত্য ব্যবহার্য শিল্প দ্রব্যের খুচরা মূল্য বজায় আছে দশ বছর আগের পর্যায়ে। অথচ এ সময়ের ব্যবধানে গড় মাসিক বেতন বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। এছাড়া প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় মাংস ও দুগ্ধদ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার মাছ, শিশুদের জুতা ও পোশাক ইত্যাদি অনেক কিছুই বিক্রি হয় উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কম দামে। লোকসান পূরণ হয় সরকারি ভর্তুকি দিয়ে যার মোট পরিমাণ বছরে আড়াই হাজার কোটি রুবল।

রুটি ও রুটিজাতীয় অন্যান্য খাদ্যোপকরণ, চকোলেট ব্যতিত সকল কনফেকশনারি পণ্য, চা, চিনি, পশমীর এবং এছাড়া সুতী, পশমী ও শনের কাপড় আজ যে দামে বিক্রি হয় তা অপরিবর্তিত আছে গত বারো পছর ধরে। ১৯৬২ সাল থেকে দাম বাড়েনি মাংস ও অন্যান্য মাংসদ্রব্যের, মাখন, ডিম ও দুগ্ধদ্রব্যাদির।

অনেক জিনিসেরই অবশ্যি খুচরা বিক্রয়মূল্য বদলেছে। যেমন ধরুন, দাম বেড়েছে গয়নাপাতি, প্রাকৃতিক ফার, স্ফটিক পাত্রাদি, গালিচা, মোটর কার ইত্যাদির। মাদকদ্রব্য, আমদানীকৃত আসবাবপত্র, পেট্রল এসবেরও দাম বেড়ে গেছে এখন। অপরদিকে শস্তা হয়েছে কতিপয় মডেলের টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, রেডিও সেট, গার্হস্থ্যকর্মে ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি, কয়েকটি ডিজাইনের জুতা ও তৈরি পোশাক।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারী আছে কি?
সেইশাল শহরে আয়োজিত পাঠক সম্মেলনের প্রশ্নাবলী থেকে (পর্তুগাল)

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে শ্রমাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে লেখা আছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের আছে শ্রম অর্থাৎ বৃত্তি, সামর্থ্য, পেশাগত প্রস্তুতি, শিক্ষা এবং সামাজিক চাহিদার বিবেচনা অনুযায়ী পেশা নির্বাচন সহ গ্যারাণ্টিযুক্ত কাজ পাবার অধিকার', ধারা ৪০।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের বহু অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের প্রখর বিকাশের ফলে পরিলক্ষিত হচ্ছে শ্রমশক্তির অভাব। কাজের সমস্যা পরিণত হয়েছে তার বিপরীতে অর্থাৎ মানুষ কাজ খোঁজে না, বরং কাজ খোঁজে মানুষকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষারত বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা কোন ভাষায় পড়াশোনা করে?
ভাষা নিয়ে তারা কেমন সমস্যার সম্মুখীন হয়?
নির্মলা বাদগে (ভারত)

আমাদের দেশের উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষায়তনে পাঠ করে বিশ্বের ১৪০টিরও বেশী দেশের ছাত্রছাত্রী। অধ্যাপনা চলে রুশ ভাষায়। বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা তা শেখে এক বছরের প্রস্তুতি অনুষদে। আধুনিক ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি তাদের সাহায্য করে দ্রুত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে রুশ ভাষা আয়ত্ত করতে।

আপনাদের সব প্রজাতন্ত্রে কি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে।
মোট কতগুলি ভাষা আপনাদের দেশে প্রচলিত?
আনলি চণ্ডি (ভারত)

সোভিয়েত ইউনিয়ন – বিশ্বের অন্যতম বহুজাতিক রাষ্ট্র। ১৯৭৯ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রায় ১৩০টি ছোট বড় জাতি-উপজাতি। তাদের লোকসংখ্যা ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ (রুশ) থেকে ৯০০ জন (সুদূর উত্তরের জগোষ্ঠী) পর্যন্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান তাদের প্রত্যেককে সুনিশ্চয়তা দেয় তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করার, দেয় মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার অধিকার।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন কোন সংস্থা তরুণ-তরুণীদের বিশ্রাম ব্যবস্থার দেখাশোনা করে?
এস্তের বোনিলিয়া (মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র)

সাধারণত এ ব্যাপারটি দেখাশোনার ভার থাকে কলকারখানা, নির্মাণ প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড ইউনিয়ন ও কমসোমল সংস্থার উপর। ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে এই কাজ পরিচালনা করে সর্বসোভিয়েত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের কেন্দ্রীয় পর্যটন পরিষদ। তার অধীনে প্রায় হাজার খানেক হোটেল, বিশ্রাম কেন্দ্র, ক্যাম্পিং, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি আছে। গোটা দেশ জুড়ে এগুলি ছড়ানো। প্রতি বছর পঁচিশ লক্ষেরও বেশি তরুণ-তরুণীর জন্য আন্তর্জাতিক যুব পর্যটন ব্যুরো 'স্পুতনিক' সোভিয়েত অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলিতে পর্যটনের, যুব শিবির ও কেন্দ্রে বিশ্রামের এবং বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে, যুবসম্প্রদায় – সমাজের সবচেয়ে চটপটে অংশ, আবেগপ্রবণ, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে, সেইজন্য পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বব্যবস্থিত বিশ্রাম ব্যবস্থার চেয়ে স্বতন্ত্র পর্যটনই বেশি পছন্দ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্মবিশ্বাসীদের জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।
মস্কো ও অন্যান্য শহরে গির্জা বা মসজিদ আছে কি?
ত. ব. লক্ষণন্ (ভারত)

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের কোনো স্থান নেই। তবে সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকেরই আছে যেকোনো ধর্ম মানার অধিকার, অবশ্য এই শর্তে সে ধর্মের রীতি আচার আইন লঙ্ঘন কিংবা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার সংকোচন করবে না এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না। রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ এবং গির্জা একে অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে ২০ হাজারেরও বেশি গির্জা, মসজিদ, সিনাগোগ ইত্যাদি। ধার্মিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নানা ঘরবাড়ি ভাড়া নেয়া, নির্মাণ অথবা ক্রয় করার অধিকার।

বর্তমানে মস্কোয় প্রার্থনা চলে ৪৪টি অর্থোডক্স গির্জা, রোমান-ক্যাথলিক চার্চ, ব্যাপটিস্ট খ্রীষ্টানদের প্রার্থনা গৃহ, সিনাগোগ ও মসজিদে। সকল ধার্মিক সমবায় নিজ প্রয়োজন মতো পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে পারে: তার মুদ্রণ প্রস্তুতি চলে সমবায়সমূহের প্রকাশনা বিভাগে আর ছাপা হয় রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ভবনগুলিতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৮টি মাধ্যমিক ও উচ্চ ধার্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা ছাড়া আছে ৪০টি বিশেষীকৃত কারখানা, যেখানে তৈরি করা হয় ধর্ম ও গির্জা সম্পর্কিত বিভিন্ন দ্রব্যাদি।

আপনাদের দেশে ব্যালের পাঠ নেয়া যায় কোথায়?
এসিলা মেনেজেশ (ব্রেজিল)

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কৃতি মন্ত্রকের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পরিচালনাদপ্তর থেকে আমাদের জানানো হয়েছে:

নৃত্যকলা খুবই জনপ্রিয় আমাদের দেশে। তার সঙ্গে শৈশবেই পরিচয় শুরু হয় শহর ও গ্রামে সংস্কৃতি ভবনাদি, ক্লাব, পাইওনিয়ার ভবনের নৃত্যকলার চক্রগুলিতে। এমন চক্রের সংখ্যা ১৬ হাজারেরও বেশি।

পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের প্রস্তুতির জন্য বড় বড় শহরে আছে কোরিওগ্রাফিক বিদ্যালয়, যার মধ্যে ব্যালে, সঙ্গীত ও সাধারণ শিক্ষা স্কুল সংযুক্ত। সেগুলিতে ভর্তি করে নেয়া হয় স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পাশ করা এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছেলেমেয়েদের। এধরনের বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রার্থীদের পরীক্ষা বেশ কঠিন। মস্কো কোরিওগ্রাফিক বিদ্যালয়ে প্রতিবছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আসা প্রায় দু' হাজার প্রার্থীর মধ্যে ভর্তি হয় মাত্র ৯০ জন।

আমি কিণ্ডারগার্টেনে প্রতিপালিকার কাজ করি। বিশেষভাবে তাই জানতে আগ্রহী প্রাক্ স্কুল বয়সীদের প্রতিপালন সংক্রান্ত নানা বিষয়: তাদের প্রাত্যহিক রুটিন, খাদ্য ও ব্যবহারের নানা জিনিসপত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এসব জানালে খুবই খুশি হতাম।

মার্গোত বাউম
(গণতান্ত্রিক জার্মানি)

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাক্ স্কুল প্রতিপালন ব্যবস্থা কেমন – প্রশ্নটি করা হয়েছিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত পাঠক-পাঠিকা সম্মেলনে।

শৈশব স্মৃতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অধিবেশনে রিপোর্ট শোনা হল ইয়েরেভানের 'সেবাস্তিয়া' নামে ১৫৯ নম্বর কিণ্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষা ভেরোনিকা গেভোরকিয়ানের। অনুমোদন করা হল এই কিণ্ডারগার্টেনের কর্মীদলের কাজ, বিশেষ করে, শ্রম-শিক্ষার অভিজ্ঞতা। এ সম্পর্কে বর্ণনা করছেন আমাদের সংবাদদাতা ল. কভিন্কো এবং আ. শ্পিকালভ।

শৈশবের স্মৃতি... জীবন পথের গোড়ায় মানুষের মনে যা গেঁথে যায়, অনেক সময়েই তা সারা জীবনের জন্য তার নৈতিক সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়।

'সেবাস্তিয়া'র ছেলেমেয়েদের ঘিরে থাকে সদ্ভাব ও সহানুভূতির সুন্দর এক পরিবেশ। শুধু শিক্ষিকারাই এই পরিবেশ গড়ে তোলেন নি। তাঁদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন বাপ-মায়েরা। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়ানো, শনিবার বা রবিবারের স্বেচ্ছা শ্রমদান, কিণ্ডারগার্টেনের উৎসব ইত্যাদিতে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন।

কিণ্ডারগার্টেনের গোটা জীবনপদ্ধতি ছেলেমেয়েদের আচরণ ও ব্যবহারের ধরন গড়ে তোলে: এখানে কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। কাজ ছাড়াও থাকে না, অন্যকে বিরক্তও করে না। 'সেবাস্তিয়ার' ছেলেমেয়েরা আর সবার মতোই সাধারণ ছেলেমেয়ে: ওই বয়সের অন্যান্য সুস্থ ছেলেমেয়েরা যেমনটি হয়। তারা ছোটাছুটির খেলা ভালবাসে, সোরগোল, ফূর্তিতে জুটি নেই তাদের। তবে, যাকে বলে কাজের সময় কাজ। আর চিত্তাকর্ষক কাজেরও কোনো অভাব নেই।

প্রিয় পাঠকেরা, এবার আপনাদের 'কারিগর নগরীতে' আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আসুন এবার এই ঘরটায় ঢোকা যাক...

দেবদারু কাঠের ছিল্‌কের গন্ধ। ঠুক-ঠাক, নানা আওয়াজ হচ্ছে... ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। প্রত্যেকের পরনে – কাজের এপ্রন, তার বুকের কাছে বড় একটা পকেট। হাতে যন্ত্রপাতি, একেবারে সত্যিকার, তবে ছোট। আর ছেলেমেয়েরা সেগুলো ধরছেও বেশ নিপুণভাবে। একজনে করাত দিয়ে কাঠের একটা টুকরো কাটছে, আরেকজন তার ধারগুলো পরিষ্কার করছে, আবার অন্য জন শিরিষ-কাগজ দিয়ে কাঠের টুকরো মসৃণ করছে। পাশেই-টেবিলের উপর, আঁকা ছবি দেখে, খুঁটির গায়ে নক্সা দাগছে: গাজর, পিয়াঁজ, মুলো। একপাশে তৈরি জিনিসপত্র: বাগানে পোঁতার জন্য খুঁটি, দেখাবে কোথায় কি গজাচ্ছে। এটা মাঝারি গ্রুপের ফরমাস, ওরা এখনও পড়তে পারে না, কিন্তু কালই সবজি বাগান বানাতে যেতে হবে! তাই ফরমাসটা জরুরী। কাজ চলছে জোরকদমে!

পরের ঘর। লম্বা টেবিলের একটা পাশ রঙচঙা টেবিল-ক্লথে ঢাকা, তার উপর বড় একটা ডেকচি। তাতে সত্যিকার খামির দিয়ে মাখা ময়দা ফুলে ফেঁপে উঠছে, মিষ্টি প্যানকেক তৈরি হবে। টেবিলের পাশে – ক্ষুদে কনফেকশনাররা। ছেলেদের মাথায় উঁচু সাদা টুপি আর মেয়েদের মাথায় – রুমাল। সকলের পরনে সাদা এপ্রন আর আর্মলেট। প্রত্যেকের হাতে বেলনা। নিজেরাই তৈরি করেছে।

কাজ শেষ হল। সকলে দৌড়ে বেড়াতে বেরুলো। যারা ডিউটিতে ছিল, তারা এত সুন্দরভাবে সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখল যে মনে হচ্ছিল জিনিসপত্র নিজে নিজেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবশেষে কোনায় গিয়ে দাঁড়ালো ঝাড়ুটা। আর কাজ শেষে ছেলেরা হাসি-হুল্লোড়ে গিয়ে যোগ দিল সাথীদের সঙ্গে।

সামনে থেকে আসছিল অন্য একটা গ্রুপ। আগে আগে চলেছিল চারজন, হাতে তাদের এনামেলের গামলা। গামলায় – সিদ্ধ করা সবজি। কাজ হল – সিদ্ধ সবজি ছাড়িয়ে, তারপর কেটে স্যালাড তৈরি করা – সকলের দুপুরের-খাওয়ার জন্য।

...এ ঘরে সেলাইয়ের কলের ঘর্ঘর আওয়াজ। এটা পুতুলের ফ্যাশনে-পোষাক তৈরির দর্জিখানা। প্রত্যেকেরই দরকার পাজামা, প্যাণ্ট, ব্লাউজ, বাহারে, ফ্রক, আরও অনেক কিছু। দর্জি হলেন – শিক্ষিকা। আর কাপড় – শিশুদের পোষাক তৈরি কারখানা থেকে পাঠানো বস্ত্রের টুকরো। অলঙ্করণের জন্য ব্যবহার করা হয় – ন্যাকড়া, বিশেষ কাঁচি দিয়ে কাটা ক্রুশের কাজ ইত্যাদি। ছেলেমেয়েরা শক্ত করে বোতাম বসাতে পারে, সুন্দরভাবে সহজ সেলাইও করতে পারে।

একদল যখন সেলাই করছে. অন্যদল তখন প্লাস্টিকের ব্লকের সাহায্যে পুতুলের জন্য আসবাবপত্র তৈরি করছে। 'তৈরি জিনিস' দেখে শিশুদের কল্পনাশক্তি ও পছন্দে সত্যিই অভিভূত হতে হয়। যেমন ধরুন, বসার ঘরের জন্যে এই আসবাবপত্র: সবুজ পায়াওলা চেয়ার, টেবিলের পায়া – সাদা, আর পাশেই সাদা আর সবুজে বাঁধাই করা সোফা। ডিজাইনারের পরিকল্পনা এরকম।

...আসুন এবার দেখতে যাওয়া যাক হলঘর, ওখান থেকে অর্কেস্ট্রার জোর আওয়াজ আসছিল। এখানে মাঝারি গ্রুপের ছেলেমেয়েরা আর্মেনীয়া নাচ-গান শিখছে। এবার চলুন, শরীরচর্চার হলঘরে। এখানে এখন শরীরচর্চার ক্লাস চলছে। এরপর চলা যাক শীতকালীন বাগানের মতো দেখতে করিডরের দিকে, এখানে অনেক আলো। ছবি আঁকা, পড়া আর গণনা যারা শিখতে চায় তারা এসেছে এদিকে...

এবার 'কারিগর নগরীর' চারপাশটা ঘুরে দেখা যাক। রাস্তা আর ইঁটের উঁচু দেয়ালের মাঝে সামান্য একটু জায়গা। প্রতিটি কেয়ারি দুভাঁজ করা ছোটদের চাদরে ঢেকে দেওয়া যায়। কিন্তু বাগানের পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়: একটি বাজে কুটোও নেই, প্রতিটি কেয়ারির পাশে রয়েছে পরিচিত – পেয়াঁজ, গাজের, মুলো ইত্যাদির ছবি দাগা খুঁটি। বাগানের পর – ক্ষেত। বড়দের পক্ষে লাফ দিয়ে এ জায়গাটা পার হয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়। ক্ষেতে ফলেছে গমের ফসল। শীষ উঠেছে ঘন হয়ে, পাশাপাশি। শিগ্‌গিরই কিণ্ডারগার্টেনে ফসল সংগ্রহ করা হবে... ছোট ছোট হাতগুলো শীষ থেকে সযত্নে বেছে নেবে প্রতিটি ফসলের দানা। সবচেয়ে বড় দানাগুলো আলাদা করে রাখা হবে বীজ হিসেবে। আর বাকিগুলো কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে ময়দা-কলে।

ছেলেমেয়েদের ভাগ্য ভাল: ফোঁয়া ময়দা ফিরে আসে ছেলেমেয়েদের কাছে 'সেবাস্তিয়ায়'...

ঐ দিন রোজকার প্যানকেক ইত্যাদিদের বদলে বিকেলের খাওয়ার জন্য সেঁকা হয় সাধারণ রুটি, তাতে থেকে যায় হাতের আঙুলের মর্মস্পর্শী ছোপ। ঠিক যেমন বিক্রি হয় দোকানে। তেমন দেখতে, তবে একেবারে তেমন নয়, প্রত্যেক ছেলেমেয়ে জানে: এই রুটি তৈরি হয়েছে তাদের নিজেদের ফলানো গমের ময়দা থেকে।

প্রত্যেকের সামনে গরম সুরভিত রুটির টুকরো। ছেলেমেয়েরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, গন্ধ শোঁকে, সযত্নে হাত বোলায় তাতে, সাবধানে একটু ভেঙে খায়, তারপর বাকিটা কাগজে মুড়ে বাড়ি নিয়ে যায়। নিজেদের কিণ্ডারগার্টেনের ক্ষেতে ফলানো গমের রুটি তারা নিজেদের আপনজন, আত্মীয়স্বজনদেরও খাওয়াতে চায়।

সময় কেটে যাবে। অনেক কিছুই ভুলে যাবে ওরা, স্মৃতি থেকে মুছে যাবে। কিন্তু নিজের শ্রমে ফলানো গমের রুটির স্বাদ 'সেবাস্তিয়া'র বহু ছেলেমেয়েদের মনে চিরদিনের মতো গেঁথে থাকবে – শৈশবের স্মৃতি হিসেবে। আর, বোধ হয়, সারা জীবনের জন্য তার নৈতিক সম্পদ হয়ে থাকবে।

সৃজনকর্মে হাতেখড়ি।

বয়সে বড় হলেও বান্ধবী।

সূর্য খেলা সকালে।

খুব দরকারি কাজ।

প্রতিদিনই নতুন কিছু
না কিছু দেখি।

জন্মদিন।

সাক্ষাৎ রূপকথা।

কচিকাঁচার ছবিতে
সুন্দর বিশাল পৃথিবী।

দোলনায় দোদুল দুল...

আপনাদের জন্যে এনেছি...

আপনাদের দেশের ধর্ম সেবীরা শান্তি ও উত্তেজনা প্রশমনের আন্দোলনে অংশ নেয় কি?

মোহম্মদ হাশেম আলি (বাংলাদেশ)

শান্তির সংগ্রামে ঐক্য

সম্প্রতি মস্কোয় 'পরমাণবিক বিপর্যয় থেকে জীবনের পবিত্র অর্জন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ধর্ম সেবীরা' নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল – শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা।

ধর্ম সেবীদের এই মহৎ উদ্যোগ সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের সরকার ও শুভেচ্ছাপ্রণোদিত সকল মানুষের। সম্মেলনের অংশীদের উদ্দেশে প্রেরিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি নিকোলাই তিখনোভের অভিনন্দন বাণীতে বলা হয়: 'এই সম্মেলনে একত্রিত বিশ্বের প্রধান প্রধান সব ধর্মের প্রতিনিধিদের শান্তি সংক্রান্ত কার্যকলাপ হচ্ছে শান্তিপ্রিয় শক্তিসমূহের যৌথ সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরমাণবিক হুমকির বিরুদ্ধে ধর্ম সেবীদের সংগ্রাম সর্বান্তকরণে সমর্থন করে সোভিয়েত সরকার।'

সম্মেলনের অংশীরা অভিনন্দনের উত্তরে যে বার্তা প্রস্তুত করেন তাতে বলা হয়: 'আপনার বাণীটি নিরস্ত্রীকরণ ও পূর্ণাঙ্গ শান্তির প্রতি সোভিয়েত জনগণের আকাংক্ষারই প্রমাণ। এটি যে শান্তি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাপ্রণোদিত মানুষ ও ধর্মবিশ্বাসীদের সমবেত সংগ্রামে আহ্বান জানায় তা আমাদের মতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি যে এই বাণীতে আপনি প্রকাশ করেছেন শান্তি সমস্যার প্রতি সোভিয়েত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাদের সরকারের উদ্বেগ, আর সম্প্রতিকালের জটিল অবস্থায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণ, উত্তেজনা প্রশমনের অগ্রগতি ও বিশ্বের বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তার সদাভিপ্রায়।'

বিশ্বকে পরমাণবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা, প্রতিটি মানুষ ও সমগ্র মানবজাতির সেরা অধিকার – জীবন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা – এ ছিল মস্কোয় ধর্ম সেবীদের সম্মেলনের মর্মকথা, তার অংশী ও অতিথিদের মনোভাব। সুতরাং এই আন্তর্জাতিক ফোরামের এমব্লেম যে মাটিতে গজে ওঠা পেলব অংকুরের ওপর সযত্ন দুটি হাত ছিল তা অকারণে নয়। সবুজ অংকুরের পাঁচটি পাপড়ি – পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক, সব ক'টিকেই পরমাণবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে হবে মানবসমাজকে।

সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ৯০টিরও বেশি দেশের প্রায় ৬০০ জন প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ – বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি। তাঁরা সকলে মস্কো সম্মেলনে যে একই চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন তাতেই উপলব্ধি করা যায় শান্তি দৃঢ়ীকরণ আর পরমাণবিক বিপর্যয় থেকে মানবজাতিকে সংরক্ষণের কর্তব্য কত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে রাজনীতিক না হয়েও সম্মেলনের অংশীরা আলোচনা করেন সম্প্রতিকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নাদি নিয়ে। তাঁদের মতে শান্তি সংরক্ষণের প্রশ্নটি পৃথিবীর সাধারণ তথা সকল মানুষেরই সমস্যা।

এই আন্তর্জাতিক ফোরামের অংশীরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অবনতির জন্য সর্বাগ্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী ঘোষণা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশ ও সাইবেরিয়ার মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ইমাম মুফতি তালগাত তাজুদ্দীন সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসক মহল ও তার বৃহৎ সমরশিল্প কারবারীদের নীতিই হচ্ছে অস্ত্র প্রতিযোগিতার গতিবৃদ্ধি ও নতুন বিশ্ব যুদ্ধের বিপদ উৎপত্তির হেতু। এমনি রাজনীতির অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে পেণ্টাগনের অদৃষ্টপূর্ব বিপুল বাজেট। প্রতিবছর তা ২৬ হাজার কোটি ডলারেরও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অতিক্রম করবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি ডলার। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তেজনা সংঘটন ও জিইয়ে রাখার জন্যও দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সিরিয়ার ওয়াকফ সম্পত্তির মন্ত্রী মোহম্মদ আল-খাতিব উল্লেখ করেন, 'ইজরাইলের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে গোটা আরব জাতির বিরুদ্ধে আগ্রাসনের বিস্তার। এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব পুনর্প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী ওয়াশিংটন। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আগ্রাসন হুমকি এনেছে কোটি কোটি আরবের প্রাণবিনাশের, আরবদের মৌলিক ঐতিহ্য ও পবিত্র সব স্থান ধ্বংসের।

মস্কো সম্মেলনের অংশী, বাংলাদেশের বিশিষ্ট ধর্মসেবী আবুল ফজল মোহম্মদ সফিউল্লাহ আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে আলাপে বলেন, – এখন মধ্যপ্রাচ্যের যেসব জায়গায় রক্তগঙ্গা বইছে সেখানের ও বিশ্বের সব অঞ্চলের জনগণ খুব ভালো জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, আজও ভোলেনি তার বিভীষিকা। সবার মনেই জীবন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মানবেতিহাসের প্রথম পরমাণবিক বোমাবর্ষণের শিকার হিরোসিমা ও নাগাসাকির করুণ চিত্র। এর চেয়ে পৈশাচিক নৃসংসতা আর কিছু হতে পারে না। সমরবাদীদের এমন অপকর্ম সাধনের সুযোগ আর কখনও দেয়া উচিত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা মাঝে মাঝে অবশ্য অস্ত্রপ্রতিযোগিতা সীমিতকরণের কথা বলে। কিন্তু শান্তি দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে তাদের বাস্তব পদক্ষেপ কোথায়?

জনাব সফিউল্লাহ জোর দিয়ে বলেন যে 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে বিশ্বের প্রধান অস্ত্র সরবরাহক। আজ অস্ত্র বিক্রয় থেকে মার্কিন একচেটিয়া কারবারগুলির মুনাফা হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা হারাতে চায় না। কিন্তু এ তো অস্ত্রের নয়, মৃত্যুর বাণিজ্য। বিকাশমান দেশগুলিকে অস্ত্রসজ্জার জন্য মোটা টাকা খরচ করতে বাধ্য করে ওয়শিংটন। এ সুযোগে সেগুলিকে নিজের অধীনতায় বেশি করে টেনে আনে, কেননা এতে নবীন দেশসমূহের ঋণ বৃদ্ধি পায়, স্থবির হয়ে থাকে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশ।'

সম্প্রতি ল. ব্রেজনেভ বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্ব রাজনীতিকে তুলনা করেছেন চৌমাথার সঙ্গে। তার কাছে এসে ঠিক করতে হয় এখন কোথায় যাওয়া যায়। সঠিক সিদ্ধান্তের উপরই আজ নির্ভর করছে রাষ্ট্র, গির্জা, রাজনীতি, কিংবা ধার্মিক নাস্তিক সব মানুষ তথা জীবন সমেত গোটা মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ। মস্কোর ধর্মসেবীদের সম্মেলনে তার অংশীরা মানবজাতিকে কোথায় যেতে হবে এ প্রশ্নের সঠিক ও নির্দিষ্ট উত্তর দিয়েছেন: শান্তির পথে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে।

ইউ. কিরিচাতি

সন্তানবহুল পরিবার আছে কি সোভিয়েত ইউনিয়নে?
কুমারী শোভা জৈন (ভারত)

আমাদের দেশে পাঁচ থেকে দশ কিংবা ততোধিক সন্তান-সন্ততির মোট পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ। ছবিতে এমনি একটি পরিবার দেখছেন আপনারা।

আর্তিকোভ পরিবার পুরুষানুক্রমে নিয়োজিত খামারীর পেশায়। তাঁরা বাস করেন তাশখন্দ শহরের পশ্চিম প্রান্তের এক মহল্লায়। পরিবারের কর্তা মুহাম্মেদজান আর্তিকোভ যখন সবে আঠারোয় পা দিয়েছিলেন তাঁর উপর নেমে আসে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের বিপর্যয়। ১৯৪২ সালে স্তালিনগ্রাদ রক্ষার লড়াইয়ে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। এক বছর হাসপাতালে কাটানোর পর ফিরে আসেন আপন গ্রামে।

'বাড়ি ফিরছিলাম ঠিকই', স্মৃতি আওড়ালেন মুহাম্মেদজান, 'কিন্তু সারাটা রাস্তা ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করে কাটাব বাকি জীবনটা! লাঠি ছাড়া তো চলতে পারি না। ক'দিন পর যখন কাজে লেগে গেলাম তখন কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম আহত হবার কথা... তারপর সুখের মুখ দেখলাম, দেখা পেলাম ভালোবাসার, বিয়ে করলাম...'

মাকসুমা তাকে উপহার দিয়েছে দশটি সন্তান। বড়ো পরিবার, এটা কি সুখের কথা নয়!

মুহাম্মেদজানকে রসিকতাচ্ছলে ছেলেরা বলে, 'আমাদের সভাপতি'। আসলেও খামারের মতোই বিরাট তাদের সংসার। সব মিলে ৩৪ জন লোক! দশ ছেলে-মেয়ে, চৌদ্দটি নাতি-নাতনী, দুই ঠাকুমা, জামাই, বৌমা...

সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে তাশখন্দ, আশেপাশে বেড়ে চলেছে তার সীমানা, কৃষিক্ষেত ক্রমেই সরে যাচ্ছে দূরে... পুরনো দিনের গ্রামটি এখন পড়েছে শহরের সীমানায়, আতিকোভরা হয়েছেন শহুরে। তাই বলে জমির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি: তাশখন্দে বাস করলেও কেউ কর্মীদের দলনেতা, কেউ কৃষিবিদ কেউবা কৃষিযন্ত্র চালক হিশেবে কাজ করছেন ফসলের মাঠে।

পরিবার বড়ো হলে নাকি অনেক ঝামেলা। মাকসুমা কিন্তু তা মনে করেন না।

'বড়ো পরিবার, মানে শৃঙ্খলা বেশি', হেসে বললেন তিনি, 'আসল কথা, সবাই যেন ঠিকমতো জানে নিজের কাজ। বড়ো ছেলেমেয়েরা অনেক সাহায্য করে আমাকে, ছোটোরাও যে হাত গুটিয়ে থাকে তা নয়... মনে পড়ে, সপ্তম সন্তান সায়রার জন্মের সময় রাষ্ট্রীয় খামারের সভাপতি বলেছিলেন, 'দ্যাখো মাকসুমা, এখন তুমি বাড়িতে থাকলেই ভালো হয়, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা কর, খামার দেখার লোক কোথাও থেকে জুটে যাবেই। পরিবারে তোমার দরকার অনেক বেশি।' চেষ্টাও করেছিলাম বাড়িতে বসে থাকার। মন মানে নি বেশিদিন। শুধুই ভাবতাম, কেমন কাজ চলছে আমার ব্রিগেডে? শেষটায় আর পারি নি, আবার যোগ দিয়েছিলাম খামারের কাজে। শুধু নবম সন্তান ফুরকত জন্ম নিলে (ততদিনে নাতি-নাতনীও হয়েছে) ছাড়তে হল খামার। দেখছেনই তো কতগুলি বাচ্চাকে মানুষ করতে হবে এখন!'

ফটো: আ. গদুনোভ

আমি একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে কাজ করি। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে পণ্য বিপণন ব্যবস্থায় কর্মীদের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

ইকেদা আকিকো (জাপান)

আপনার প্রশ্নের উত্তর হিশেবে এখানে মস্কোর একটি বৃহৎ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে দর্শনযাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। আমাদের সাংবাদিকের সঙ্গে ছিলেন স্টোরটির একটি বিভাগের ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির কার্যকরী সংসদ সদস্যা, বিপণনকর্মী **কাপিতোলিনা গ্রুশিনা**। তার কথা দিয়েই শুরু করা যাক:

'১৯৬৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর উদ্বোধন হয় আমাদের স্টোরটির আর একেবারে শুরু থেকেই তাতে কাজ করছি আমি। খুব ভালো লাগে এখানে, তাই অন্য কোথাও বদলি হবার কথা আদৌ ভাবি না। স্টোরটির অবস্থান মস্কোর এক বৃক্ষ শ্যামল মহল্লায়, আধুনিক সুসজ্জিত ভবনে। তার সবক'টি তলাই আলো খেলামেয়, পুরোপরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পন্ন। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের দোকানটির যে 'পিয়েভোমাইস্কি' (পয়লা মে) বাসন্তী উৎসবের নাম তা খুবই যুক্তিযুক্ত।

'একদিনে আমরা প্রায় ৮ লক্ষ রুবলের ব্যবসা করি। বিক্রির জন্যে আমাদের আছে ৩৩ হাজার বিভিন্ন পদের পণ্য, তার মানে, মস্কোবাসী কিংবা রাজধানীর অতিথিরা কিছু না কিছু অবশ্যই কিনতে পাবেন। হিসাব করে দেখা গেছে দিনে এখানে আসেন ৭৫

কাজ করি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে

ফটো: ভ. ভলোদকিন

হাজার খরিদ্দার। তাঁদের সেবায় আছেন ৯০০ জন বিপণনকর্মী, তবে শতকরা ৯০ ভাগই – নারী।

'আমি কাজ করি মেয়েদের ওভারকোট বিক্রির বিভাগে। এই বিশাল স্টোরটিই বহুবিভাগেই আমাদেরটির মতো স্বয়ংসেবা ব্যবস্থা। বিপণনকর্মীরা মূলত ক্রেতাদের পরামর্শদাতা, পণ্য বাছাইয়ে সহায়তাকারী। আমাদের কাজের এই দিকটিই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। আর শুধু আমিই নয়, আমার সব সহকর্মীও এমনি মনে করে।'

কাপিতোলিনা মাফ চেয়ে নিলেন এরপর। ক্রেতারা তাঁর অপেক্ষা করছিল তাই তাঁর বদলে আমাদের সঙ্গ দিলেন পুরুষদের ওভারকোট বিভাগের তাতিয়ানা গাস্পারিয়ান। তিনি বললেন,

'আমার বান্ধবীদের দেখুন, তাঁরা খুবই সহৃদয়, একে অপরের প্রতি মনোযোগী, দোকানে যারা আসেন যত্ন নেন তাঁদেরও সকলের। আর সবার মতো আমিও কাজ করি দিনে ৮ ঘণ্টা, বিশ্রাম নিই রোববারে। নিজের পছন্দমতো সপ্তাহের আরও একটি দিন ছুটি নিতে পারি আমি। বাড়ির সবার সঙ্গে একত্রে থাকার বেশ সুবিধা এতে।

'আমার চাকুরি জীবন দশ বছরের। এর মধ্যে এই স্টোরে কাজ করছি সাড়ে তিন বছর। খুবই সন্তুষ্ট এখানের কাজে। আমাদের ভালো একটি ক্যান্টিন আছে, আছে খাবার দাবার কেনার সুবিধার্থে অগ্রিম ফরমায়েশ ব্যুরো, ক্লোকরুম, শাওয়ার, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-বিধান পালন কক্ষ ইত্যাদি অনেক কিছু।

'আমাদের একটি ছোটোখাটো পলিক্লিনিকও আছে দোকানেই। সেখানে কাজ করেন থেরাপিউটিস্ট, দন্ত চিকিৎসক, গাইনোকোলজিস্ট ও ফিজিওথেরাপিউটিস্ট মিলে চারজন ডাক্তার। আমাদের কচি ছেলেমেয়েদের জন্যে আছে ক্রেইশ ও কিণ্ডারগার্টেন, স্কুলবয়সী ছেলে-মেয়েরা ছুটিতে যায় পাইওনিয়ার শিবিরে। শিগগিরই আমাদের হবে ৩২০টি আসনের নিজস্ব পাইওনিয়ার শিবির – দোকানের পরিচালনাদপ্তর ও ট্রেড ইউনিয়ন, এজন্যে ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ করেছে।'

এক অবসরের সুযোগ নিয়ে কাপিতোলিনা আ-বার এলেন আমাদের কাছে। নিজের কথার খেই ধরে বললেন,

'আমাদের বিপণনকর্মীদের অনেকেই তরুণ – শত-করা ৩০ জন। স্কুল পাশ করে যারা এখানে আসে তারা পেশাগত প্রশিক্ষণ পায় কাজের মাধ্যমে। প্রথম দিকে তারা কাজ করে অভিজ্ঞ কর্মীর শিক্ষানবিশ হি-শেবে। মাস ছয়েক পর তাদের পরীক্ষা দিতে হয়। তাতে পাশ করলে তাদেরকে নিয়োগ করা হয় কনিষ্ঠ বিপণণকর্মীর পদে। একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই – ইরিনা করোবভা কাজ করে ক্রীড়াপোশাকের বিভাগে।'

– কী ইরিনা, দোকান ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবছ নাকি?

'ঘূর্ণাক্ষরেও না। মাঝে মাঝে অবশ্যি বেশ কঠিন লাগে, বিশেষ করে মরশুমী ক্রীড়াপোশাক কেনার হিড়িক পড়লে। সে সময় আমাদের বিভাগে দিনে দু'হাজার খরিদ্দার ভীড় করে। আমাদের পেশায় প্রয়োজন বিশেষ দৈহিক সামর্থ্য, মানসিক প্রস্তুতি। আমাদের যে পরিপাটি বিশ্রাম কক্ষ আছে তা বেশ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এখানে আলাপ করা যায় মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে, পড়া যায় লাই-ব্রেরি থেকে নেয়া বই ও পত্র-পত্রিকা। আমাদের অনেক মহিলাকর্মী আবার নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করতে ভালোবাসেন। আমি অবশ্যি প্রমোদযাত্রায় যেতে ভালোবাসি। ট্রেড ইউনিয়নের খরচায় ২-৩ দিনের জন্যে যাওয়া যায় লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, পুশকিনের মিখাইলোভ-স্কোয়ে কিংবা প্রাচীণ সুজদালে, নৌবিহারে যাওয়া যায় মস্কোভা নদীতে...'

কাপিতোলিনা জানালেন, মস্কো শহরের বিপণন-সংস্থা ও ভোগ্যপণ্য সমবায়সমূহের ট্রেড ইউনিয়ন আমাদের স্টোরের কর্মীদের জন্যে বছরে ১৫০টি ব্যব-স্থাপত্র দেয়, আর শুধু বিশ্রামের ব্যবস্থাপত্র কেনাতেই ব্যয় করে বছরে ১৫ হাজার রুবল।

ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে আমাদের পরিদর্শন পরিক্র-মার খতিয়ান টেনে কাপিতোলিনা বললেন, 'দেখলেন তো, আমাদের কর্মীদের নিজস্ব ট্রেড-ইউনিয়ন অনেক কিছুই করছে, বিশেষত, নিয়মিত যত্ন নিয়ে আসছে যেন প্রতিনিয়ত উন্নত হয় কাজের পরিবেশ, দৈনন্দিন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা।'

'পিয়েৰ্ভোমাইস্কি' ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরটি অবস্থিত মস্কোর এক বৃক্ষ শ্যামল মহল্লায়।

দোকানের এক তলা থেকে অপরতলায় ওঠানামার সুবিধার্থে আছে চলন্ত সিঁড়ি।

বিপণনকর্মী – অতি উত্তম এক পেশা...

প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে এমনি ব্যায়াম করে সবাই।

নিজের ফ্ল্যাটে পণ্য বিশেষজ্ঞ লারিসা জিমচুক।

দুপুরের খাবারের জন্যে বাইরে যেতে হয় না দোকান ছেড়ে।

কন্সার্টের মহড়া দিচ্ছেন সৌখিন শিল্পীরা।

চিকিৎসাকক্ষে দাঁতের ডাক্তার দেখানো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নারীরা তাদের ছুটি কাটায় কীভাবে?

মারিৎসা এনরিকেস কাস্তিলিয়ো (কিউবা)

শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের সমাধিকারী নারীরা স্বভাব-তই ভোগ করে বাৎসরিক সবেতন ছুটিরও অধিকার। তারা কীভাবে বিশ্রাম করে তা অল্প কথায় বলা মুশকিল: লোকভেদে রুচি, পছন্দ ও সখের বৈচিত্র্য তার কারণ।

মেহনতীদের সুশৃঙ্খল বিশ্রামের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র। ১৩ হাজার স্যানাটোরিয়াম, বিশ্রাম ভবন, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি একই সঙ্গে গ্রহণ করে ২০ লক্ষ, আর বছরে ৫ কোটিরও বেশি লোককে। ট্রেড ইউনিয়নের স্যানাটোরিয়ামের এক পঞ্চমাংশ আর আরাম ভবনের দশ শতাংশ টিকিট দেয়া হয় বিনা মূল্যে, আর বা-কিগুলির জন্য নেয়া হয় মোট মূল্যের ৩০ শতাংশ। বাকি খরচ বহন করে ট্রেড ইউনিয়ন।

মাতা-পিতাদের অনেকে পছন্দ করে শিশুদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে। সেকারণে পারিবারিক বিশ্রাম ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়।

নারীদের অনেকে ছুটি কাটায় নিজস্ব অথবা ভাড়ায় নেওয়া বাগান-বাড়িতে, কৃষ্ণ ও বালটিক সাগ-রের উপকূলে কিংবা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। তরুণ-তরুণীদের বেশি ভালো লাগে পর্যটন প্রমোদ ভ্রমণ ইত্যাদি।

সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলিতে পরিবর্ধিত সময়ের গ্রুপগুলি কি ভাবে কাজ করে?

সোনিয়া সালগাদো (কিউবা প্রজাতন্ত্র)

আমাদের দেশে পরিবর্ধিত সময়ের বিদ্যালয় ও গ্রুপে লেখাপড়া করে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ৩০ শতাংশেরও বেশি, অর্থাৎ এক কো-টিরও বেশি ছেলেমেয়ে (বর্তমানে পাঁচসালায় তাদের সংখ্যা আরও ৩৫-৪০ লক্ষ বাড়বে)। এ ধরনের বিদ্যা-লয় ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ক্ষেত্রে বাপ-মা'কে সা-হায্য করার একটি রূপ: ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শুরু হবার সময় ক্লাসে আসে, তারপর এখানেই সারা দিন (১০ ঘণ্টা) থাকে। পরিবর্ধিত পাঠ্যদিনের সময় নির্ঘণ্ট তৈরি করা হয় ডাক্তারী ও শিক্ষামূলক সুপারিশ অনু-যায়ী: এখানে পাঠ ও খেলাধুলোর ক্লাস, বাড়ির পড়া তৈরি করা, বিশ্রাম, আমোদ করা এবং সামাজিক কাজ এ সবই খাপ খাইয়ে তৈরি করা হয়। ছেলেমেয়েরা গরম গরম খাবার পায়, বাপ-মাকে এজন্য খুব কমই খরচ করতে হয় – দিনে মাত্র ৩৫ থেকে ৬০ কোপেক। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের শিশুদের জন্য দিনের বেলায় ঘুমের ব্যবস্থা আছে। যদি পরিবর্ধিত পাঠ্যদিনের নির্ঘণ্টে ৮০ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী যোগ দেয়, তাহলে শিশুদের সঙ্গে কাজের ব্যবস্থা করা হয় ক্লাস অনুযায়ী। যদি শিশুদের সংখ্যা কম হয় তাহলে পরিবর্ধিত পাঠ্যদিনের গ্রুপে বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীকে নেওয়া হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি অন্য স্কুল থেকেও।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন

আর সব দেশের মতোই সোভিয়েত ইউনিয়নেরও সার্বভৌমত্বের নিদর্শন হিশেবে আছে রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও রাষ্ট্রীয় পতাকা। রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও পতাকা আছে আমাদের সব পূর্ণাঙ্গ ও স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্রেরও। এসবে প্রতিফলিত আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য। সেগুলিতে নিহিত জাতিতে জাতিতে, সকল উপজাতি ও লোকগোষ্ঠীর মাঝে অদৃষ্টপূর্ব ঐক্য ও মৈত্রীর গূঢ় দর্শন।

এখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন (মাঝখানে) ও আমাদের পনেরোটি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ছবি ছাপা

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের প্রতিচ্ছবি দেয়া হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ৭০ নম্বর ধারায় উল্লিখিত ক্রমানুবর্তিতা মেনে:

অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই লেনিন স্বাক্ষর করেন রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত সনদপত্র। তাতে ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে দেশের সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর সমাধিকার ঘোষণা করা হয়। লেনিনের জাতিসম্পর্কীয় নীতি উত্তরের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে সেকেলে জীবনযাত্রার অচল পাথর ডিঙিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপের সুযোগ এনে দেয়। সোভিয়েত সরকারের প্রথম দিকের বছরগুলিতেই তাদের মুক্তি দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন করের বোঝা থেকে, নিয়ম করা হয় তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ঋণদান ব্যবস্থার, গড়া হয় বসতি পল্লী, স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়, বোর্ডিং স্কুল, হাসপাতাল, ক্লাব, কুটির শিল্প কারখানা।

সোভিয়েত শাসনামলে সংখালঘু জাতিসমূহ নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে। তৈরি হয় জাতীয় অঞ্চল, পরে সেগুলি নাম পায় স্বায়ত্তশাসিত জেলার। বর্তমানে আমাদের দেশে এমন জেলা দশটি, প্রতিটিই প্রতিনিধি পাঠায় রুশ ফেডারেশন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে। বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলি নিজ নিজ আওতায় সঙ্ঘবদ্ধ করে কয়েকটি করে জাতি ও উপজাতি।

রুশ ও অন্যান্য জাতির ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্য সহযোগিতায় প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত জেলাতেই গড়ে উঠেছে তার নিজস্ব শিল্প। কঠিন আবহাওয়ার জনবিরল বহু স্থানে দ্রুত বসানো হচ্ছে তেল ও গ্যাসের পাইপলাইন, মাথা তুলছে শক্তিশালী বিদ্যুৎকেন্দ্র, পরিবাহী তারের খুঁটি।

তুষারাবৃত হিমেল মাটির বুকে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক ঘরবাড়ির নতুন নতুন শহর ও জনপদ, সর্বত্রই আছে সংস্কৃতি সদন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আধুনিক দোকান-পাট, সুইমিং পুল ইত্যাদি। দূর দূরান্তের এসব জায়গা রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত নৌ, রেল ও বিমান যানবাহনে।

অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে ক্রান্তীয় উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল অশিক্ষিত, তাদের নিজস্ব বর্ণলিপিও ছিল না। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণ দূর করা হচ্ছে নিরক্ষরতা, অধিকাংশ জাতির ভাষাতেই তৈরি করা হয়েছে বর্ণলিপি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিকের মতো এভেন ও নানাইৎস, তোফালার ও অরোচ সব জাতির লোকেরাই বাধ্যতামূলক ভিত্তিতে শেষ করে মাধ্যমিক স্কুল, পায় সাধারণ ও বিশেষ মাধ্যমিক আর উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ভাষায় আছে পাঠ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই, বক্ত-পত্রিকা।

সংখ্যালঘু জাতিসমূহের একটা বিরাট অংশ নিজ নিজ মাতৃভাষা ছাড়াও খুব ভালো দক্ষতা রাখে রুশ ভাষায়। আমাদের বহুজাতিক দেশের সব জাতি একে অপরকে ভাব বিনিময় করে এ ভাষাতেই।

ন. কপিলোভা

'চুকোৎকা অপারেশন' – এটা হচ্ছে আমাদের দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সব প্রজাতন্ত্রের পাইওনিয়ারদের সর্বসোভিয়েত এক উদ্যোগের নাম। দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তের ছেলেমেয়েদের উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা – সংগৃহীত লোহা-লক্কড়, পুরনো কাগজ, বনৌষধি তৃণলতা ইত্যাদি বিক্রয়ে ও কৃষিকাজে বয়স্কদের সাহায্যে শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত টাকা দিয়ে চুকোৎকা স্বায়ত্তশাসিত জেলার আনাদির শহরে গড়বে স্কুলের ছেলেমেয়ে ও পাইওনিয়ারদের প্রাসাদ। নির্মাণের জন্যে তারা জমা দেয় ২০ লক্ষাধিক রুবল। কন্সার্ট ও খেলাধূলার হল, সুইমিং পুল আর কিশোর প্রযুক্তিবিদ, শিল্পী ও চলচ্চিত্রামোদীদের চর্চাকক্ষ সহ সুন্দর প্রাসাদটি নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে। চুকোৎকার শিশুদের জন্যে এ ছিল এক বিরাট উৎসব।

হান্তি-মান্সি স্বায়ত্তশাসিত জেলার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করে ৭ সহস্রাধিক ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাকর্মী। খুবই জনপ্রিয় রুশ ফেডারেশনের সম্মানীয় চিকিৎসক খেতাবপ্রাপ্ত পেডিয়াট্রিস্ট ইয়ে. ম. সাগান্দুকোভা। স্থানীয়া মেয়েদের তিনিই প্রথম চিকিৎসকের ডিগ্রি পান ত্রিশাধিক বছর আগে।
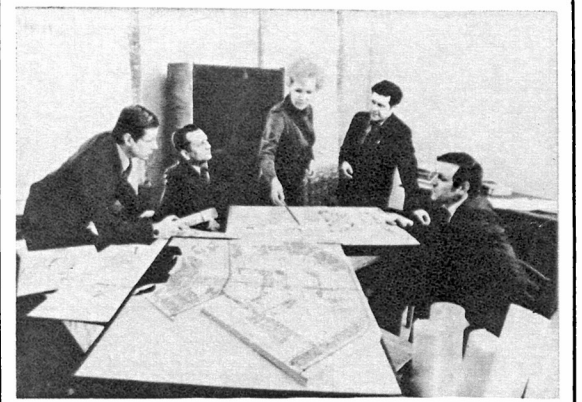
কোমি-পের্মিয়াৎস্কি স্বায়ত্তশাসিত জেলার কেন্দ্র কুদিমকার শহরের গণপ্রতিনিধি পরিষদের নির্বাহকমণ্ডলি গঠন করেছেন একটি নগরনির্মাণ পরিষদ। ছবিতে: একাদশ পাঁচসালায় কুদিমকার নগরীর নির্মাণকর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা। মাঝখানে – শহরের প্রধান স্থপতি স. ভ. কার্তাশোভা।

কোরিয়াকি স্বায়ত্তশাসিত জেলার কেন্দ্রীয় বসতি পালানার প্রযুক্তিগত পেশা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় হরিণ পালকদের সুবিধার্থে তৈরি করে যোগাযোগ কর্মী ও যান্ত্রিক যানবাহন চালক। ক্লাস পরিচালনা করেন আ. তিনেনেতেকিয়েভ।
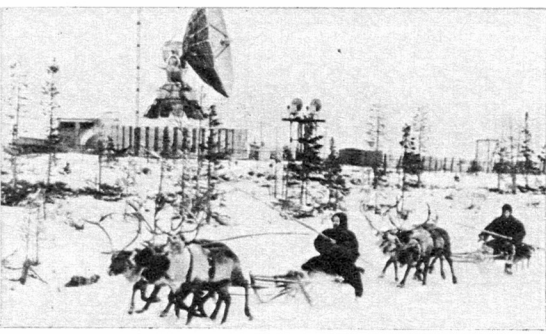
মস্কো টেলি প্রচার বাবস্থার রঙীন অনুষ্ঠানাদি দেখে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তের হরিণ পালক ও মৎসশিকারিরা, গ্যাসোত্তলন কর্মী আর ভূতত্ত্ববিদরা। তুন্দ্রার বিশাল প্রান্তরভূমিতে মাথা তুলেছে 'অর্বিতা' টেলিযোগাযোগ বাবস্থার বৃহদাকার অনেক টাওয়ার।
ছবিতে: স্বায়ত্তশাসিত ইয়ামালো-নেনেৎস জেলার একটি টেলিভিশন কেন্দ্র।

এভেনকি স্বায়ত্তশাসিত জেলার কেন্দ্রীয় বসতি তুরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই এখানে নির্মাণ করা হয় ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং স্কুল, সংস্কৃতি ভবন, হাসপাতাল, আউট-ডোর চিকিৎসালয়, যক্ষ্মা ক্লিনিক, পশু চিকিৎসালয়, সাধারণ স্নানাগার ও বস্ত্র পরিশোধনাগার। বসতিটি এখন বৃহৎ এক শহরের তুল্য, ক্রমেই বাড়ছে নবনির্মিত ভবন, দৈনন্দিন সেবা প্রতিষ্ঠান আর সংস্কৃতি সদনের সংখ্যা। সম্প্রতি এখানে একটি বৃহদাকার নতুন ইউনিভার্সাল শপ খোলা হয়েছে। তাতে আছে কাপড়চোপড় ও প্রসাধন সামগ্রী, শিশুদের প্রয়োজনীয় জিনিস ও খাতা-কলম ইত্যাদি, গার্হস্থকর্মে ব্যবহার্য উপকরণ সবই কেনার সুযোগ।

নুড়ি চেয়েছিল হবে গাঙচিল

আমাদের পত্রিকার কিশোর পাঠক পাঠিকাদের জন্য এই কথিকাটি পাঠিয়েছেন পর্তুগালের মারিও জোসে ফের্নান্দেস

ক্ষুদে তরঙ্গ চঞ্চল খেলা করতে ভালোবাসতো সাগরের নীল জলে। হাওয়ায় ভর করে অনায়াসে তা উঠে যাচ্ছিল অনেক উঁচুতে, নিচে ছিটকানি দিয়ে পড়ছিল ফেনিল জলের ফোয়ারা।

আরও উঁচুতে, নীলাকাশে তুষারশুভ্র তুলোর মতো ক্লান্তিহীন উড়ছিল গাঙচিল।

আর তীরের বালিতে নিশ্চল পড়ে ছিল ছোট্ট নুড়িপাথর। তারার মতো চকচক করছিল সে, ঠিক যেমনটি গ্রীষ্মের রাতে ঢেউয়ের আয়নায় করে চন্দ্রকিরণ।

তিনজনের খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

সন্ধ্যেবেলা আঁধার নেমে এলে গাঙচিল ঘুমুতে যেতো তার নীড়ে। ক্ষুদে তরঙ্গ সবার কাছে বিদায় নিয়ে হারিয়ে যেত দূর সমুদ্রে। শুধু নুড়ি বেচারা একাকী থেকে যেতো তীরে। কতোই না চিন্তা আ-সতো তার মাথায়!

'হায়, কেন যে আমি নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারি না?' – ভাবতো সে। অন্ধকারে চোখ মেলে নিজেকে বলতো, 'আমি যদি উড়তে পারতাম, দেখতে পেতাম দূরের সমুদ্র, তেপান্তরের মাঠ, গোটা দুনিয়াটাই। চুপচাপ এক জায়গায় পড়ে থাকা, এ কেমন জীবন? পাথর হয়ে জন্মানোই অভিশাপ। পারলে আমি হতাম... এরপর আর ভাবতে পারতো না সে। সাগরের ঘুমপাড়ানি গান তাকে পাঠিয়ে দিত স্বপ্নের রাজ্যে।

একদিন হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। নুড়ির গায়ে গজে উঠল পাখা, বিহঙ্গের মতো উড়ে গেল সাগরের আকাশে, বিস্তীর্ণ জলদেশ, সবুজ বেলাভূমি, তরঙ্গে রোদের খেলা সবই দেখল সে। কি আশ্চর্য সুন্দর তা! কিন্তু একি? হঠাৎ সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে... অরে তারপরই... ভেঙ্গে গেল ঘুম। তাকে তা দিচ্ছিল উষ্ণ সূর্য, আদরে চুমু খাচ্ছিল তরঙ্গমালা। তবুও নুড়ি দুর্ভাগা ভাবলো নিজেকে, অজান্তেই কেঁদে দিল গলা ফাটিয়ে।

কান্নার শব্দে ভয় পেয়ে কাঁকড়া চিৎকার করে উঠল, 'হায়, হায়, কী ঘটল?' নুড়িকে কাঁদতে দেখে বলল, 'ও, তুমি নাকি? এ কেমন ধারা কথা? পাথর কাঁদে, তাতো দেখি নি কোনো দিন। তা, হয়েছেটা কী?

'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে গাঙচিল হয়ে গেছি। ঘুম ভাঙলে বুঝলাম আমি শুধুই পাথর। যদি জানতে, কেমন আমার ওড়ার ইচ্ছা...' আবার কেঁদে উঠল নুড়ি।

এই সময় আকাশে দেখা দিল গাঙচিল। কাছে উড়ে এসে বন্ধুকে কাঁদতে দেখে খুব অবাকই হল সে।

'এই, কী হয়েছে, কে দুঃখ দিয়েছে তোমাকে? নামটা শুধু বলো, দেখিয়ে দিচ্ছি ব্যাটাকে কত ধানে কত চাল হয়।'

'মুশকিল তো ওখানেই, কেউ দুঃখ দেয় নি। আমি নিজে চেয়েছিলাম তোমার মতো উড়তে, কিন্তু তা তো পারি না। এতেই আমার এমন কষ্ট।'

গাঙচিল বেশ চিন্তায় পড়ল এবার।

'তোমার সঙ্গে নিজেকে বদলাবদলি করার কোনো সুযোগ থাকলে এখনই রাজি হতাম পাথর হতে। তুমিও হয়ে যেতে গাঙচিল। কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়... এখন কীভাবে তোমাকে সান্ত্বনা দিই?'

কাঁকড়া বলল, 'দ্যাখো গাঙচিল, তুমি ওড়ার সময় যা কিছু দেখতে পাও সেসবের গল্প শোনালেও তো পারো নুড়িকে।'

গাঙচিল যেন অকূলে কূল পেল।

'আরে, তাই তো!' সানন্দে বলল সে।

সাগরের জলে ঢেউ খেলছিল রবিপ্রভার মেলা। দূর দেশ থেকে দুলতে দুলতে বন্ধুদের কাছে ভেসে এল ক্ষুদে তরঙ্গ।

'দাঁড়াও না একটু, এখনই শুরু করো না', আসতে আসতে বলল সে, 'আমারও খুব ইচ্ছে করছে, উপর থেকে কেমন দেখায় সাগর তা জানতে।'

গাঙচিল শুরু করল, 'জানো, আমার কিন্তু খুবই ইচ্ছে গভীর তলদেশ থেকে কেমন দেখায় সাগর সেটি জানবার। নুড়ি, কাঁকড়া, এমনকি তুমি, তরঙ্গও অনেক জানো সাগরের গভীর তলদেশ সম্পর্কে। আসো, একটা বুদ্ধি করা যায়, সবাই যে যা দেখেছে তা নিয়ে পালা করে গল্প করা যাক এখন।'

সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিন খুব ভোরবেলা, সূর্য উঠতে না উঠতেই নুড়ির কাছে উড়ে আসে গাঙচিল, ছুটে আসে ক্ষুদে তরঙ্গ আর তার কাঁধে চড়ে বীরের মতো এসে হাজির হয় কাঁকড়া মশাই। তারা একে অপরকে জানায় কী অবাক কাণ্ড ঘটে সাগরের গভীরে, উন্মুক্ত নীলাকাশের কী রহস্য, গ্রীষ্মের উজ্জ্বল সূর্য কী মহিমায় উজ্জ্বল করে তোলে সাগর ও আকাশ।

এঁকেছেন : আ. দর্মেঙকো

কাজাখস্তানের বিচিত্র গালিচা

ডানপাশে দিগন্ত ছেয়ে ছড়িয়ে আছে টিলাঘন বিশাল তৃণপ্রান্তর, বামে ঘাস-লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত গগনচুম্বী পর্বতশ্রেণী। আঁকা-বাঁকা সরিসৃপ, পথের দু' ধার বেয়ে ঢিমে তেতালা এগিয়ে চলছিল ঊর্ধ্বারোহী ভেড়ার পাল।

'দেখছেন, কেমন গজিয়েছে চি-ঘাস', বললেন আমাদের সহযাত্রী, লৌকিক বুনন প্রণালী গবেষণার চিমকেন্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মী আমান সাহিয়েভ। দেখলাম শূন্য স্তেপভূমিতে ঘন ঝোপের মতো দাঁড়িয়ে আছে মাথা সমান উঁচু তৃণের ডগা। সাহিয়েভ জানালেন, 'এ দিয়ে মাদুর বানানো হয়, আর সাধারণত তার উপর বসেই আমাদের মেয়েরা বোনে গালিচা।'

চিমকেন্তের বাজারে কত ধরনেরই না চিত্রিত গালিচা দেখা যায়!

অদ্ভুত সুন্দর দক্ষিণ কাজাখস্তানের প্রশস্ত স্তেপভূমি। খাগড়ার মতো ঘাস, অথচ বানিয়ে ফেলেছে এক ঘনারণ্য। জলাভাবে খাঁ খাঁ করছে চারিদিক, তবে শুষ্ক, শোভা বিবর্জিত ঘাস দাঁড়িয়ে আছে খাড়া, শুধু মাঝে মধ্যে ঈষৎ মাথা দুলাচ্ছে হাওয়ায়।

এ অঞ্চলে একদা পশু চরাত স্তার্শি জুজের কাজাখরা। স্তার্শি জুজ – এটা দক্ষিণ কাজাখস্তানের প্রতিবেশী স্থানীয় গোত্রসঙ্ঘের নাম। পালা করে তৃণভূমি বদলিয়ে তারা চরে বেড়াত এখানে, শীতের বিরতির পর আবার বেরুত মাঠে... যাযাবর জীবন নির্ধারণ করে তাদের কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য, নারী ও পুরুষের মাঝে শ্রমের বণ্টন। পশুপালন থেকে আসত খাদ্য, পোশাক আর পারিবারিক আয়।

ঘোড়া সাজাতে ওস্তাদ ছিল কাজাখরা। তারা কাঠ কুঁদে বানাত পেয়ালা, তৈরি করতো দুধ রাখার জামবাটি, বড়ো বড়ো গামলা ইত্যাদি। আর সব পাত্রে ছবি তুলত খোদাই করে কিংবা রূপা ও রঙীন পাথরের গুঁড়া বসিয়ে। অলঙ্কারাদি ও চামড়ার জিনিসপত্র বানানোয় জুড়ি ছিল না তাদের। হস্তশিল্পের অধিকাংশ কাজই ছিল মেয়েদের দায়িত্বে। তাঁবুর ছাউনির জন্যে ত্রিপল বানাতো তারা, তারাই বানাতো চিত্রিত গালিচা ও তোয়ালে, বর্ষাতি, বালিশ, নানা ধরনের খোলস, থলি ও আঁশ সুতার অন্যান্য অনেক জিনিস। তারা বুনত সাধারণ ও আঁশ সুতার গালিচা, দড়ির থলি, পাপোশ, বনাত ইত্যাদি। সূক্ষ্ম কাজে চিত্রিত করত আড়ম্বরী গালিচা, পর্দা, তোয়ালে আরও কত কী। দড়ি গাঁথুনি, পশুচর্ম প্রক্রিয়াজাতকরণ আর শ্যামই বানানো এসবও ছিল মেয়েদের হাতে।...

আমরা ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছি পাহাড়ী স্তেপের পথে। আমান জানালেন, 'সামনেই আলগাবাস গ্রাম, আর এই যে পাশে দেখছেন, এটা কাজিগুর্ত ঢাল, পর্বত শ্রেণীর সীমানা। পশ্চিম তিয়ান-শান শেষ হয়েছে এখানেই...'

আঁশ সুতার সচিত্র সূচিকর্ম তার বহু প্রাচীন ঐতিহ্যে আজ সমুজ্জ্বল পাহাড়ী পল্লীতে। কল-কারখানায় তাঁবু, চিত্রিত গালিচা ও আঁশ সুতার অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের কাজ শুরু হলেও বজায় আছে এ লৌকিক শিল্প। ভূতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে তাঁবুর ছাউনি কিংবা মেঝেতে বিছানোর উপযুক্ত খসখসে ত্রিপল থেকে শুরু করে আঁশ তুলার জটিল টুপি পর্যন্ত সব ধরনের হস্ত শিল্প কাজাখস্তানে চালু ছিল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দির মাঝামাঝি আমলেই।

পাহাড় থেকে নামা ছন্দ হিল্লোল স্রোতস্বিনী পার হতেই সামনে পড়ল তরুবীথি ছাওয়া ছোট্ট এক দ্বীপ। 'গন্তব্যে হাজির', জানালেন আমান, 'এখন নিজেরাই ঠিক করুন, কোন বাড়িতে যাবেন।'

হাতের কাছে প্রথম যে বাড়িটি ছিল তাতেই ঢুকলাম। জানতে পেলাম, এই বাড়িতে থাকেন 'পের্ভোমাইস্কি' রাষ্ট্রীয় খামারের স্থানীয় বিভাগের অধিকর্তা সাপারবেক কশকিনবায়েভ। অতিথিমাত্রই সমাদরের পাত্র – এ নিয়ম কাজাখস্তানের সর্বত্র। আর যতক্ষণ আপনি গৃহকর্তার সঙ্গে আলাপ না সেরেছেন, যতক্ষণ না চা ও ঘোড়ার দুধ খেয়েছেন কাজের কোনো কথাই চলতে পারে না এখানে।

অপূর্ব সুন্দর চিত্রিত গালিচায় বসে ঘোড়ার দুধ

পশ্চিম তিয়ান-শানের শেষ সীমান্তে।

কশকিনবায়েভ পরিবারের তৈরি চিত্রিত গালিচা।

হাতে তৈরি আঁশ সুতার পুরু কাপড়।

খাচ্ছিলাম আমরা। সাপারবেক বললেন যে তার এই স্বগ্রামটির নাম আগে ছিল উজুমবুলাক (প্রলম্বিত ঝরণা)। এ ঝরণার জল সর্বদাই স্বচ্ছ, ভ্যাপসা গরমের দিনেও বরফ শীতল। কশকিনবায়েভের পরিবারটি বেশ বড়ো – চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা তাঁদের।

'মেয়েরা কি সবাই আঁশ সুতার কাপড় বানাতে পারে ?'

'তারা সবই পারে... মারিয়া, তুমি কোথায় !' তিনি ডাকলেন স্ত্রীকে।

মেয়ে ও বৌমাদের মিলে আমাদের গালিচা দেখাতে এলেন মারিয়া।

শেষে পর্যন্ত দেখতে পেলাম আঁশ সুতার কাপড়। বুঝলাম যে এসব মূলত দুই ধরনের হয়। সির্মাক হচ্ছে নকশা-কাটা চিত্রিত গালিচা। ভিন্ন ভিন্ন রঙের দু'খণ্ড রঙীন আঁশ সুতার কাপড় একত্রে ভাঁজ করে তাতে তাদের উপরের চিত্র সামঞ্জসী কাজ তোলা হয়, অতঃপর এক খণ্ড কাপড়কে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে অপর খণ্ডে ছবির মতো নানা স্থানে লাগিয়ে দেয়া হয় সেলাই করে। সির্মাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় দেয়াল সজ্জার গালিচা কিংবা বিছানা ঢাকার চাদর হিশেবে। এটি বানানো তেমন সহজ কাজ নয়। একেকটি সির্মাকে অনেক সময় লেগে যায় কয়েক মাস। দ্বিতীয় ধরনটিকে বলা হয় তেকেমেত। এটিও চিত্রিত গালিচা, তবে তা চিত্রণের সম্পূর্ণ কাজ হয় হস্তশিল্পের সূক্ষ্ম সূচিকর্মে।

চায়ের আসরের জন্যে ব্যবহৃত চাদর বিছিয়ে তার উপর পশমী কাপড় মেলে ধরলেন মারিয়া। বললেন, 'ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তৈরি করে ফেলব তেকেমেত। মেয়েরা বসে গেল দুই সারিতে, হাতে তুলে নিল নমনীয় লম্বা কাঠের কাঠি, শুরু হল পশমী কাপড়ে বুননের কাজ। উপরে লুকোচুরি খেলা চলল কাঠির, পশমী সুতা শুরু করল দ্রুত ওঠা-নামা, মনে হল, সামনে বুঝি আধ মিটার পুরু কোনো নরম কাপড়ের স্তর।

তেকেমেতের ভিত তৈরি হয় এমনি গাঁথুনিতে। পরে তার উপর তোলা রঙীন পশমী সুতার সূচিকর্ম। গোটা জিনিসটাকে স্বল্পক্ষণ জাগ দেয়া হয় গরম জলে, যেন ছবি স্থায়ী ভাবে বসে যায় ভিতে।

আঁশ সুতার কাপড় বুনন – প্রকৃত অর্থে যৌথ শিল্পকর্ম। এ কাজে প্রয়োজন পরস্পরকে সাহায্যের মানসিকতা, কর্মীদের খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব। আর শ্রম যদি আনন্দের হয়, তবে তখনই তৈরি করা যায় সুন্দর জিনিস, যা টিকসই থাকে অনেক দিন।

ন. গ্রাশিন

ফটো: আ. সেমিলিয়াকা

আমার মতে পত্রিকা যদি লৌকিক পোশাক-আশাকের ডিজাইন দেখাত তবে তা হতো খুবই মনোগ্রাহী।

লিখেইয়া ইয়ানশে (হাঙ্গেরি)

ফতুয়া ও লম্বা ঝুলের স্কার্টের সেট।

বিশ্রামের উপযোগী জ্যাকেট ও ট্রাউজারের সেট।

ফতুয়া ও ট্রাউজারের সেট।

বিশ্রামের উপযোগী পোশাক।

ডিজাইনার: ন. কপেলোভিচ, ও. সেনচেঙ্কো, ল. তোমারেভস্কায়া

ফটো: ব. পক্রোভস্কি

ফ্রুঞ্জের ডিজাইন

কির্গিজিয়া প্রজাতন্ত্রের ফ্রুঞ্জে শহরের ফ্যাশন ভবনটি চালু হয়েছে বিশ বছরেরও অধিক কাল আগে। বর্তমানে তা প্রজাতন্ত্রের পোশাক ও জুতা শিল্পের জন্য বিভিন্ন ডিজাইন তৈরির কাজে নিয়োজিত।

নৃতত্ব, লৌকিক পোশাক-আশাক প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার ভিত্তিতে কির্গিজিয়ার ডিজাইনাররা রচনা করেন সুন্দর সুন্দর আধুনিক পোশাকের নমুনা। উৎসবানুষ্ঠান ও বিশ্রামের উপযোগী পোশাকে তাঁরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন লৌকিক অনেক উপকরণ। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্করণের পোশাক সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ, জাতীয় রীতির সামঞ্জস্যী টুপি ইত্যাদির খুবই চাহিদা বাজারে।

পোশাকের সূচিকর্মে
লৌকিক চিত্ররেখন।

মস্কোয় বিদেশী

সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চশিক্ষার্থে আসেন বিশ্বের বহু দেশের অনেক ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের তরুণতরুণীরাও আছেন। সোভিয়েত ডিপ্লোমা পেয়ে তাঁরা স্বদেশে ফিরে যান সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ হিশেবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জীবন কেমন? – এ প্রসঙ্গে প্রায়ই জানতে চান আমাদের পাঠকপাঠিকারা। প্রশ্নটির উত্তর দিতে আমরা অনুরোধ করেছিলাম বাংলাদেশের তাহমিনা আলমকে:

'সোভিয়েত ইউনিয়নে আমি কাটিয়েছি সাত বছর, তবে এখানে কখনও একা অনুভব করি নি নিজেকে। আমার বন্ধুবান্ধব অনেক, আকর্ষণীয় অনেক কিছু দেখেছি আমি।'

তাহমিনা মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। এখন স্নাতকোত্তর কোর্সে থিসিস লিখছেন দর্শনশাস্ত্র বিভাগে।

তাহমিনা বলেন যে ছাত্রজীবনের সঙ্গেই জড়িত তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি। তাঁর সোভিয়েত বন্ধুবান্ধবের মাঝে নাম করতে হয় প্রাক্তন সহপাঠী ইউলিয়া নিকোলায়েভা, ইউলিয়া আক্সানভা, নাতালিয়া ফেওফানভা, ইউরি কোসাচেভ, ইউরি স্কিদানেনকো ও ভিক্তর মিশাকিনের।

বিভিন্ন দেশের বিদ্যার্থীদের মাঝে মৈত্রী হয় একত্রে পড়াশোনায়, গবেষণা ও সামাজিক কাজকর্মে, অবসর বিনোদনে। তাহমিনাও সক্রিয় অংশ নেন সামাজিক জীবনে। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী কমিটির কার্যকর পরিষদ সদস্যা, ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত হন তার সভানেত্রী পদে। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে ভালো কাজ করে অনেক সুনাম অর্জন করেন।

'নারী কমিটিতে কাজ ছিল খুবই আগ্রহোদ্দীপক', বলেন তাহমিনা। 'আমাদের মেয়েদের জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে নতুন অর্থে। আমি ও আমার বান্ধবীরা বিভিন্ন দেশে নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি, পরিচিত হই নারী সমাধিকার ও শান্তির বিশিস্ট সংগ্রামীদের সঙ্গে। আমাদের কমিটির অতিথি হয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলা ডেভিস।'

তাহমিনাকে অনেক কাজ করতে হয়, ঘরের যত্ন-আত্তির জন্যও সময় লাগে, কিন্তু এতে দুর্বহ বোধ করেন না তিনি: তাহমিনা ভালো গৃহকর্ত্রী, সূচিকর্ম ভালোবাসেন। বুনন-কাজ তাঁর শখ। তিনি যে শুধু ভালো বোনেন তাই নয়, আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত বয়ন শিক্ষার লেখাগুলি প্রস্তুতিতেও অংশ নেন।

'আমার জন্য মস্কো – সুখের নগরী', বলেন তিনি। 'এখানে আমি ও আমার স্বদেশবাসীরা পেয়েছি উচ্চশিক্ষা, হয়ে উঠেছি সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ। আমার স্বামিও এসেছে বাংলাদেশ থেকে, আমাদের পরিচয় ঘটে মস্কোয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে। সে সমাজতত্ত্ববিদ, আমি যে দর্শনশাস্ত্র অনুশীলন করতে শুরু করেছি, তাতে তারও অবদান আছে। ডেমোক্রেটিস, সক্রেটিস, এরিস্টোটল, কাণ্ট, মার্ক্স, লেনিনের অনেক কাজ বুঝতে সেই সাহায্য করেছে আমাকে।'

অনেক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে তাহমিনা তাঁর সোভিয়েত অধ্যাপদের কথা বলেন:

'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমাকে ও আমার স্বদেশবাসীদের সাহায্য করেছেন নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হতে। প্রকৃত বন্ধুর মতো সাহায্যে আসতে সর্বদাই প্রস্তুত তাঁরা। তাঁদের বিশেষ মনোযোগ আমরা টের পাই প্রস্তুতিমূলক বিভাগে। আমাদের শিখিয়েছেন রুশ ভাষা, সহায়তা করেছেন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে। আমাদের জন্য উৎসাহ ও সময় ব্যয়ে কার্পণ্য করেন না তাঁরা।'

তাহমিনা বই পড়তে ভালোবাসেন। প্রিয় লেখকদের মাঝে তিনি তলস্তয়, চেখভ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলামের নাম করেছেন।

বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা লাভ করে শুধু বইয়ের মাধ্যমেই নয়, তাদের আছে এখানের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, সোভিয়েত মানুষদের জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ। ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের জন্য আয়োজন করে দেশের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ও শহরে প্রমোদ ভ্রমণ। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তাহমিনা প্রায় সারা দেশ সফর করে এসেছেন।

'আমরা অনেক কিছু দেখেছি। শুধু লেনিনগ্রাদেই গিয়েছি পাঁচ বার। এই সুন্দর শহর আমি ভালোবেসেছি মনে প্রাণে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের রাজধানী: আলমা-আতা, ফ্রুঞ্জে, তাশখন্দ, কিয়েভ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। বিশেষ করে আমার ভালো লাগে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলি, যেখানে দেখেছি প্রাচীন ও আধুনিকের সুপরিকল্পিত সামঞ্জস্য। সর্বত্রই আমরা পেয়েছি সোভিয়েত মানুষদের বন্ধুসুলভ আতিথ্য, সবখানে আমাদের উষ্ণ, আন্তরিক সম্বর্ধনা করা হয়। বিশ্বের বহু দেশে আমার যে অনেক বন্ধু আছে তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ মস্কোর কাছে।'

তাহমিনার স্বপ্ন – দেশে ফিরে শিক্ষক হওয়া। তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হবে, জীবনে তিনি সুখী হবেন এটাই কামনা করি।

ম. রোমাশকো

ফটো: ভ. ভলোদকিন

ছাত্রী
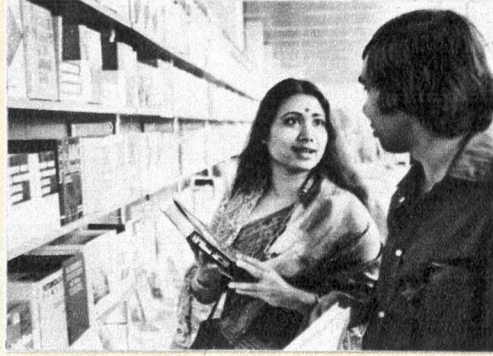
উপহারসামগ্রীর দোকানে তাহমিনা ও তাঁর স্বামী বদরুল আলম খান।

লেনিন হিল্‌সের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে তাহমিনা ও বদরুল আলম খান।

আর্ট গ্যালারিতে।
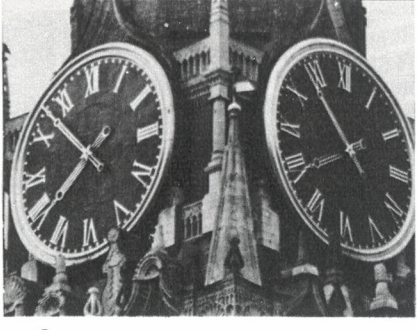
ক্রেমলিন

পাঠকদের অনুরোধে চালু করা পত্রিকায় দেশভ্রমণ বিভাগে এই সংখ্যায় ছাপা হল মস্কোর ক্রেমলিন পরিদর্শনের বিবরণী।

সোভিয়েত রাজধানী মস্কোয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমরা শুরু করেছি পত্রিকার গত সংখ্যা থেকে। রেড স্কোয়ারে এসে ক্রেমলিনের স্পাসকি মিনারের সামনে থেমেছিলাম আমরা। আর আজ ক্রেমলিনের প্রাচীর ঘিরে একটা চক্কর দেবার পর আমরা যাব তার ভেতরে। রূপক অর্থে মস্কোর প্রাণকেন্দ্র এখানেই। মস্কো নগরী একদিন এখান থেকেই শুরু হয়েছিল।

সে ছিল ১১৪৭ সালের ঘটনা। আজ যেখানে ক্রেমলিন অবস্থিত সে জায়গাটা তখন একটা উঁচু টিলার মতো ছিল। আর তার দু'পাশ ঘিরে বইছিল স্বচ্ছ জলের ভরা নদী মস্কভা ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী নেগ্লিন্‌কা। টিলার উপরে ছিল ঘণশ্যাম দেবদারু বীথি। নাইট ইউরি দোল্‌গোরুকি তাঁর কেল্লা নগরীর জন্যে জায়গা খুঁজতে গিয়ে বেছে নেন এই টিলাটিকেই। নাইটের সেনা-সামন্তরা বিশাল কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলে টিলাটি। মাটিতে গর্ত করে সমান জায়গায় গড়ে তোলে বাসোপযোগী কোঠাবাড়ি। শুরুতে এমনিই ছিল ক্রেমলিনের চেহারা। চতুর্দশ শতাব্দীতে কাঠের প্রাচীর পাল্টিয়ে গড়ে তোলা হয় শ্বেত প্রস্তরের দেয়াল। সামরিক প্রয়োজনে বানানো হয় কয়েকটি মিনারস্তম্ভ। আজ যে ক্রেমলিনকে আমরা দেখি তার মূল কাঠামো গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে। সমসাময়িক ক্রেমলিন আনন্দ দেয় মস্কো ও তার অতিথি সকল দর্শকের মনে।

ক্রেমলিনের বিশাল স্থাপত্য সমাহারটি গড়ে ওঠে কয়েক শতাব্দী ধরে। তার বিভিন্ন ভবন ও নির্মাণ নিদর্শন বৈচিত্র্যে অপরূপ, অতুলনীয় অভ্যন্তরভাগের গভীর সামঞ্জস্যশীল অলংকরণ।

ক্রেমলিনের ঘণ্টা ঝোলানো অনন্য স্পাসকি মিনার দেখা শেষ করে চলুন যাওয়া যাক মস্কভা নদীর তীরের দিকে। ক্রেমলিনের প্রাচীর ঘেঁষে আমাদের পথে স্পাসকি মিনারের পর প্রথমে পড়বে ক্ষুদ্রাকৃতি সুন্দর জারের

মিনার, তারপরই – পাগলা ঘণ্টির মিনার। কোনো এক সময় এখানের ঘণ্টি বাজিয়েই সবাইকে সংবাদ দেয়া হত আসন্ন বিপদের। একটু সামনে এগোলে দেখবেন কনস্তান্তিনো-ইয়েলেনা মিনার, মস্কভা নদীর মিনার... ইত্যাদি। সব মিলে এখানে মিনারের সংখ্যা কুড়িটি। এদের পাঁচটির মধ্য দিয়ে রাস্তা আছে ক্রেমলিনের ভেতরে ঢোকার। এগুলি হচ্ছে স্পাসকি, বরোভিৎস্কি, ত্রইৎস্কি, নিকোলস্কি ও কনস্তান্তিনো-ইয়েলেনা মিনার। সবচেয়ে বেশি উঁচু ত্রইৎস্কি। উচ্চতা – ৮০ মিটার। সবচেয়ে ছোটো – কুতাফিয়া, মাত্র ১৪ মিটার। প্রতিটি মিনার নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের। একটির সঙ্গে আদৌ কোনো মিল নেই অপরটির। তাদের অভ্যন্তরভাগ প্রকৌশলের জটিল নিয়ম-কানুনে তৈরি, বিশেষ করে সামরিক প্রতিরক্ষা উপযোগিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। একটি মিনারের মধ্যে অবস্থিত অস্ত্রাগার, তার তলা দিয়ে আজ বহু যুগ ধরে বয়ে যাচ্ছে খনিজ জলের ঝরণা।

প্রতিটি মিনার সম্পর্কেই বলা যেত অনেক কথা। সুদীর্ঘ তাদের জীবনেতিহাস। সবচেয়ে প্রাচীন তাইনিৎস্কি মিনারটি গঠিত হয় ১৪৮৫ সালে, 'নবীন' যেটি তারও বয়স প্রায় তিনশ' বছর।

ক্রেমলিনের পুরো দেয়াল গাঁথা হয়েছিল বড়ো আকৃতির লাল ইঁট দিয়ে। একেকটি ইঁটের ওজন প্রায় ৮ কিলোগ্রাম। তবে দেখলে কিন্তু তাদের মনে হবে খুবই হাল্কা, বেশ নমনীয়। দেয়ালের মাথায় সরু হয়ে আসা দ্বিধার ইঁটের গাঁথুনি থাকাতেই আসে এমন অনুভূতি। ক্রেমলিনের প্রাচীর উচ্চতায় কম নয়, স্থান বিশেষে তা ৫ থেকে ১৯ মিটার উঁচু। তবে শ্বেত পাথরের ভিতে এমনভাবে এই দেয়াল গাঁথা যে তেমন উঁচু মনে হয় না। দেয়ালের প্রস্থও অনেক – ৩ থেকে ৬ মিটার। পুরু এই দেয়ালের ফোকরে অনেক জায়গায় আছে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাবার পথ, সিঁড়ির গ্যালারি। আর ক্রেমলিনের গোটা প্রাচীর যে পরিধি জুড়ে আছে তা হচ্ছে ২ কিলোমিটার ২৩৫ মিটার। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ২৮ হেক্টর জমির উপরে বানানো ক্রেমলিন তো ছিল একটি সম্পূর্ণ নগরী।

ইভান দ্য গ্রেটের ঘণ্টাবাড়ি বানানো হয়েছিল ইভান স্কোয়ারে। এই ঘণ্টাবাড়ির সামনেই বসানো আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মস্কোর ঘণ্টা। ক্রেমলিনে ১৭৩৩-৩৫ সালে তা বানায় রুশ লোহা মিস্ত্রি ইভান ও মিখাইল

মতোরিন। ঘণ্টাটির উচ্চতা – ৬ মিটার, ওজন – ২০০ টন। পাশেই বসানো বৃহদাকার এক কামান। এটিও ১৫৮৬ সালে তৈরি করে রুশ মিস্ত্রি আন্দ্রেই চখোভ। কামানটির নলের ব্যাস – ৮৯ সেণ্টিমিটার। ইভান স্কোয়ারের পরে আপনি যেখানে আসবেন তার নাম গির্জা স্কোয়ার। এখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন তিনটি প্রধান গির্জা – উস্পেন্‌স্কি, ব্লাগোভেশ্যেন্‌স্কি ও আর্খান্‌গেল্‌স্কি। প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন হিশেবে এগুলি সযত্নে সংরক্ষিত।

আমরা চলছি ক্রেমলিন হয়ে, তার প্রাচীনতম রাস্তা ও অলিগলি বেয়ে। এই তো সিনেট ভবন, যা এখন সোভিয়েত মন্ত্রী পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তর। সম্রাট পরিবারের বাসস্থান ক্রেমলিনের বৃহৎ প্রাসাদও এখানে, যা বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং রুশ ফেডারেশনের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কার্যালয়।

'মস্কো, ক্রেমলিন' – সংক্ষেপে এটাই আজ দেশের পার্টি ও সরকারের কেন্দ্রীয় পরিচালনা দপ্তরের ঠিকানা। পেত্রোগ্রাদ থেকে ১৯১৮ সালে রাজধানী মস্কোয় স্থানান্তরিত হলে বিশ্বময় সবাই জানতে পায় এই নতুন ঠিকানা। ক্রেমলিনেই রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন ভ. ই. লেনিন। ক্রেমলিনের যে জায়গাগুলি মহান নেতা লেনিনের স্মৃতি বিজড়িত তাদের নিয়েও একটা লেখা প্রকাশিত হবে পত্রিকায়।

তবে আজকের লেখা শেষ করার আগে ক্রেমলিনের মিনারগুলি সম্পর্কে আরও কিছু কথা। ১৯৩৫ সালে প্রধান প্রধান মিনার স্পাসকি, নিকোলস্কি, ত্রইৎস্কি, বরোভিৎস্কি ও ভদোব্‌জোদনি এই ক'টিতে বসানো হয় লোহিত বর্ণের উজ্জ্বল তারকা। প্রতি সন্ধ্যাতেই জ্বলে ওঠে সেগুলি, কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে দেখা যায় সে আলো। মৈত্রী ও শান্তির স্নিগ্ধতা ভরা ক্রেমলিনের এই আলো যেন আমাদের দেশেরই প্রতীক।

দ. ভিজিরেঙ্কো

ফটো: ই. নসোভ

মস্কোর ঘণ্টা।
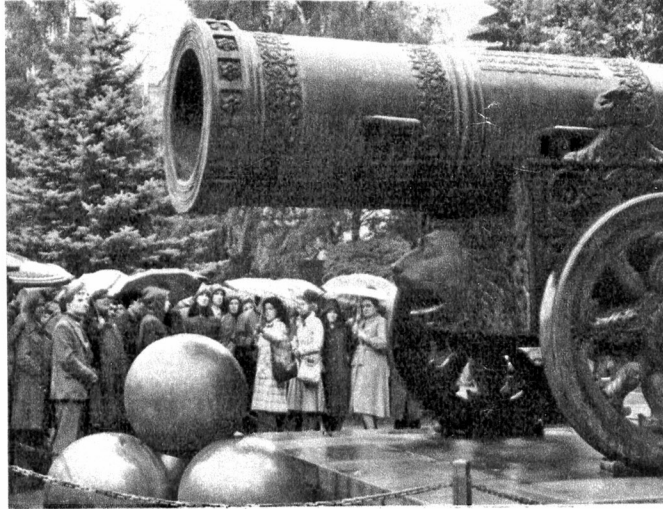
ইভান দ্য গ্রেটের ঘণ্টাঘর (উপরে)।

রাজ কামান।

ইভানভ স্কোয়ার।

ক্রেমলিনের এক মিনার।

কংগ্রেস ভবন (বামে)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

ত্রইৎস্কি মিনার।

ত. শামসুদ্দিন, আবু রিশি, খালাজ আবু মনসুর ও ফ. ই. ত্যুৎচেভের কবিতাবলম্বনে আঁকা রেখাচিত্র।

প্রাচ্য জনগণের শিল্পকলা

ছন্দোবদ্ধ রেখা

প্রাচ্য জনগণের শিল্পকলা মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত ভারতের খ্যাতনাম্নী শিল্পী আমিনা আহুজার প্রদর্শনী খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল মস্কোয়। তাঁর মৌলিক ধরনের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল এতে।

মন্তব্যখাতায় মস্কো বিশ্ববিদ্যাল–য়ের অধ্যাপিকা ই. গরশকভা লিখেছেন:

‘স্থানে কালে অপূর্ব একটি ভ্রমণ সম্ভব হয় আমিনা আহুজার চিত্রকলায়। চিত্তাকর্ষক নিকততম একটি দেশের ছন্দ বাজে তাঁর শিল্পকর্মে। ভারত সম্পর্কে, তার সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কে আরও জানার বাসনা জাগিয়ে তুলেছেন আপনি, শ্রীমতী আহুজা! আপনার সাফল্য ও পরিতোষ কামনা করি!’

আর তিমিরিয়াজেভ কৃষি আকাদমির ছাত্রী আভ্‌দেয়েভার মতে:

‘ছবিগুলিতে ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিককে যেভাবে মেলানো হয়েছে তা খুবই মনোজ্ঞ। সর্বদাই তা সুতীব্র দোলা দেয়।’

আমিনা আহুজার কয়েকটি ছবিতে চোখ বুলানো যাক। যেমন ছেলেবেলা থেকে সুপরিচিত এই জীবগুলি কিন্তু তাদের রূপায়নে অসাধারণ রূপকথা-সুলভ একটা কাব্যময়তা মন টানে। ঐন্দ্রজালিক রেখার জগতে পৌছে যাই আমরা, সেই জগত সুরে সঙগীতে ব্যঞ্জনায় নিবিড়। ছবিগুলি তলিয়ে দেখে তাদের নিচে ভারতীয়, রুশী, আরবীয় কবিতার ছত্রগুলি পড়ে আমরা দেখতে পাই তাঁর অপরূপ রেখায়ন। এখানে কবিতা ও চিত্রায়ণের মধ্যে কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। কিন্তু বহুকাল থেকে প্রাচ্যে যে লিপিকলার সমাদর তাকে অবলম্বন করে শিল্পী জাগিয়ে তোলেন আবেগের গভীরতা, ভাবান কবিদের প্রতিটি শব্দ নিয়ে...

চিত্রময়তা, কবিতা, সংগীতের আশ্চর্য মিলন ঘটেছে ভারতের মহা কবি গালিব মির্জা আসাদুল্লা-খানের নৃত্য-স্তবকের প্রকাশে:

‘আমাকে ধ্বংস করার
উগ্র ঈর্ষামদে এগিয়ে সে আসে
হাতে তার ছোরা দেখে
আমি কম্পমান।’

* * *

‘সিনাই পর্বত’পরে,
আমার উপরে কথা ছিল
পড়বে তোর হৃদয়কণিকা।’

* * *

‘পুড়িয়ে দিল না কেন
তোর মুখচন্দ্রের কিরণ।’

* * *

খালাজ আবু মনসুরের গজল অবলম্বনে নাচুনে হাতি দেখে হেসে লুটিয়ে পড়তে হয়:

‘জানি না কেন মেতে
উঠছি নেচে, হয়ত বঁধুর দেখা
পেয়েছি বলে?!’

পারস্যের মনীষী সাদীর দীর্ঘজীবী তোতা ভাবিয়ে তোলে:

‘কটু সত্যের চেয়ে ভালো যে অসত্য শুভ।’

অভিমানে মাথা নিচু করে থমকে দাঁড়ানো বৃষ (তেব্রিজী শামসুদ্দিনের কথা অবলম্বনে) আলোড়িত করে আমাদের:

‘এসো শামসী তেব্রিজী
হয়ো না নিষ্ঠুর,
তোমা বিনে চুনি পান্না
মোর কাছে ছাই।’

পালেস্টাইনের সাম্প্রতিক কবি আবু রিশীর কবিতা অবলম্বনে অসহায় ত্রস্ত বক বলে:

‘এসো ওগো, বাঁচাও আমায় ...’

আমিনা আহুজা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ। রুশ কবিদের রচনার সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় আছে, ভালোবাসেন তাঁদের। তাঁর ছবিতে রুশ ও প্রাচ্যের কবিদের পঙক্তিগুলি যে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায় সেটা আশ্চর্য কিছু নই। রুশ কবি ফিওদর ত্যুৎচেভ আর ভারতীয় কবি গালিবের নিম্নোক্ত কবিতার ছুটন্ত হরিণীর দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে:

‘আহা মোর চিরন্তণ প্রাণ!’
‘কী হল তোর অবুঝ হৃদয়!’

মন্তব্যখাতায় ইভানোভো শহরের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষয়ীত্রীর এই কথায় সায় না দিয়ে পারা যায় না:

‘আমিনা আহুজার চিত্রপ্রদর্শনী আমাদের করে তোলে নির্মল ও উন্নত। মনে হয় আমরা হয়ে উঠি সত্যিকারের লোক।’

ম. ইগনাতোভা

তদন্তকারী গোয়েন্দা পুলিশ

তদন্তকারী, টেস্ট ড্রাইভার ইত্যাদি পেশা মেয়েদের জন্যে বিরল বলেই এ সব পেশায় যে মেয়েরা কাজ করে তাদের সম্পর্কে পড়তে আমার খুবই আগ্রহ।

ইয়ানকা ভেলকভা (বুলগেরিয়া)

মিলিশিয়াতে কাজ করা কোনো নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন কিউবার পাঠিকা মোয়ে সিয়েররা গোনসালেস।

আমাদের সাংবাদিকা গ. গালিয়েভা কিয়েভ শহরের মিলিশিয়া কর্মী, তদন্তকারী মেজর **ভালেন্তিনা পলেনোভার** সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁর ও তাঁর কাজ সম্পর্কে কিছু বলতে।

– আপনি তদন্তকারীর পেশা নির্বাচন করেছেন কেন?

– শৈশবে আমার স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হবার। স্কুল শেষ করে ভর্তিও হই চিকিৎসা ইনস্টিটিউটে। কিন্তু পড়াশোনার ক' বছর অসাধারণ কোনো একটি পেশা আয়ত্ত করার ধারণা সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছিল আমার চিন্তায়। স্কুলে সহপাঠীরা আমাকে নির্বাচিত করেছিল পাইওনিয়ার কমিটির সভাপতি, আর ইনস্টিটিউটের কোর্সগুলিতে – মনিটর হিশেবে। মনে হয়, একারণেই ভুলত্রুটির প্রতি আমার অসহিষ্ণুতা গড়ে ওঠে, হয়ে উঠি সত্যসন্ধানী। স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে মানুষের জীবনকে গভীরতরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার আকাংক্ষায়। একসময় সিদ্ধান্ত নিই পড়তে যাব আইন ইনস্টিটিউটে।

– কিসে আপনি দেখেন নিজের কাজের তাৎপর্য?

– আমার মতে তদন্তকারীর পেশা একদিকে যেমন ন্যায়ের পুনপ্রতিষ্ঠা করা, অন্যদিকে তেমনি – হঠাৎ করে কেউ ভুল করে বসলে তাকে সহায়তা করা। শরীরের মতোই মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করা – এটা কি মানবিক কাজ নয়? কথা প্রসঙ্গে বলছি যে তদন্তাধীনে থাকা লোকেরা প্রায়ই চায় যেন তাদের মামলা চালায় কোনো নারী তদন্তকারী। তাদের হয়ত ধারণা যে নারীরা অপেক্ষাকৃত ভালো বোঝে মানুষের মনের অবস্থা, তার মর্মপীড়া। মানুষকে তার ভুল বুঝিয়ে দিতে, তাকে রক্ষা করতে পেরে আমি আমি খুব সান্ত্বনা বোধ করি। আমার ছেলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, সেও মিলিশিয়া কর্মী হবার স্বপ্ন দেখে। আমি যখন তার স্কুলে যাই তখন ছেলেমেয়েরা আমাকে জিগ্যেস করে: 'আপনি মিলিশিয়া কর্মী হয়েছেন কেন?' আমি তাদের বলি আমাদের মিলিশিয়ার ইতিহাস, তার কঠিন ও মহৎ কর্তব্যের কথা।

– তদন্তকারীর কাজে সবচেয়ে আসল বলে আপনি কী বিবেচনা করেন?

– আমার মনে হয় সবচেয়ে প্রধান কথা হল পথভ্রান্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দক্ষতা। এর জন্য প্রয়োজন তদন্তকারী সূক্ষ্ম অনুভূতি বোধ, তার থাকতে হবে তদন্তাধীন লোকের মনস্তত্ত্ব ও তার মানসিক অবস্থা উপলব্ধির ক্ষমতা। আমরা, তদন্তকারীরা নিয়মিত উৎকর্ষসাধন করি আমাদের জ্ঞানের।

কিয়েভ শহরের তদন্ত পরিচালনাদপ্তরের 'পেশাগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ স্কুলে' আমি অধ্যাপনা করি। অপ্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে প্রতিষেধক ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজে খুবই মনোযোগ দিই আমরা। শিক্ষকদের জন্য আইন বিষয়ে লেকচার, শহরের অধিবাসীদের জন্য 'প্রশ্নোত্তরের সান্ধ্যবাসর' ইত্যাদি আয়োজন করি, প্রায়ই প্রবন্ধ লিখি পত্রপত্রিকায়, বক্তৃতাও দিই রেডিওতে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘজীবী লোকেদের সম্পর্কে জানতে চাই। বহু দিন বাঁচার পেছনে বিশেষ কোনো রহস্য আছে কি?

মনিজ পাশকোয়াল (অ্যাঙ্গোলা)

অল্প কিছুদিন আগেও মনে করা হতো যে আমাদের দেশে দীর্ঘজীবী লোকেদের বাস শুধু ককেশাসের পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে। গবেষকরা তো দীর্ঘজীবীদের কেন্দ্র হিশেবে চিহ্নিতই করে ফেলেছিলেন মাত্র কয়েকটি স্থান। এসবের মধ্যে ছিল আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, আজারবাইজান আর এ ছাড়া উত্তর ককেশাসের গুটি কয়েক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ও প্রদেশ। নির্ধারণ করা হয়েছিল যে সবচেয়ে বেশিদিন বাঁচে সমুদ্র সমতল থেকে ৫০০ হতে ১৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতার পার্বত্য ভূমির লোকেরা। এমনি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জায়গাগুলিতে আলট্রা ভায়োলেট সূর্যরশ্মির বিকিরণ সবচেয়ে বেশি। বেশিদিন বাঁচার পেছনে যেসব কারণ আবিষ্কার করা হয়েছিল সেসব হচ্ছে: ক) চলাফেরায় বিশেষ প্রাকৃতিক ছন্দ বজায় রাখা – পাহাড়ী এলাকায় প্রায়ই তো বহু বার চড়াই উৎরাই পার হতে হয় দিনে; খ) পাহাড়ে যে সমতল ভূমির চেয়ে অম্লজান কম তার ফলে অম্লজানাভাবে অভ্যস্ত হওয়া, বৃদ্ধ বয়সে খুবই কাজে লাগে এ অভ্যাস; গ) নিয়মিত কড়া নিদ্রা উপভোগ; ঘ) পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ; ঙ) দৈনন্দিন শ্রমে দেহ মজবুত রাখা।

তবে সাম্প্রতিক হিসাবতাত্ত্বিক গবেষণা আর ১৯৭৯ সালের আদমশুমারী আমাদের গতানুগতিক ধারণা পাল্টিয়ে দিয়েছে। দেখা গেছে যে দীর্ঘজীবীদের সংখ্যার হিশেবে ককেশাসের দাগেস্তান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ও আজারবাইজানের পর তৃতীয় স্থানের অধিকারী হচ্ছে পূর্ব সাইবেরিয়ার ইকুতিয়া স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। নব্বই ও তদূর্ধ্ব বয়সী ২১ সহস্রাধিক লোকের বাস উজবেকিস্তানে। মস্কো ও তার উপকণ্ঠ, লেনিনগ্রাদ ইত্যাদির মতো বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রগুলিতেও এখন এমন বহু লোকের বাস যাদের বয়স একশ' কিংবা তারও বেশি।

ডেমোগ্রাফি বিশেষজ্ঞদের মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেদের দীর্ঘজীবী হবার পেছনে কোনো 'রহস্য' থাকলে সে হচ্ছে আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতির সামাজিক পরিবেশ। একটা যুক্তিই বোধ হয় যথেষ্ট যে সোভিয়েত শাসনের শুরুতে আমাদের লোকেদের গড় আয়ু ছিল ৩২ বছর, আর এখন তা দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর।

অশ্বারোহণ- আমার শখ

আমার মেয়ের বয়স ১২ বছর। সে আপনাদের পত্রিকায় অশ্বারোহন স্কুল সম্পর্কে, ঘোড়ার দেখাশোনা যারা করে তাদের সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়তে চায়।

জুলিয়া অ্যাডাম্‌সন
(অস্ট্রেলিয়া)

ঘোড়ায় চড়ার কঠিন কৌশল রপ্ত করতে হলে ভালোবাসতে হবে ঘোড়াকে...

শ্রদ্ধেয়া মিসেস অ্যাডাম্‌সন!

পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আমাকে আপনার চিঠিটা দেখায়। আমার ইচ্ছে হল, আপনার চিঠির উত্তরটা আমিই দিই! ব্যাপারটা হল এই যে, আমার মেয়েও ঘোড়ায় চড়া শেখার ব্যাপারে খুবই উৎসুক। প্রায় দু'বছর হল ও অশ্বারোহন স্কুলে শিখতে যাচ্ছে। মস্কোয় কয়েকটি আধুনিক অশ্বক্রীড়া-সদন সমাহার আছে, তার মধ্যে বিৎসার অলিম্পিক ক্রীড়া সদনও পড়ে। প্রত্যেকটিতেই অশ্বারোহন স্কুল আছে। তবে আমার মেয়ে মস্কোর কেন্দ্রীয় ঘোড়দৌড়ের মাঠের সঙ্গে যে অশ্বারোহন স্কুল আছে সেটিই বেছে নিয়েছে।

এখানে ১২ বছর বয়স থেকে ঘোড়ায় চড়া শিখতে ইচ্ছুক সকলকেই ভর্তি করা হয় (প্রসঙ্গত বলি, আপনি এখানে সত্তর বছর বয়সী অশ্বারোহীকেও দেখতে পাবেন)।

এই স্কুলের বয়স কুড়ি বছরের ওপর।

এখানকার ঘোড়ার ময়দানে দিনে গড়ে ২০০-২৫০ জন ঘোড়ায় চড়া শিখতে আসে। ঘোড়ায় চড়া শেখার প্রতিটি ক্লাস হয় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের, এর জন্য খরচ দিতে হয় এক রুবল। সপ্তাহে একটা ক্লাস, মাসে-চারটে। সহজেই বুঝতে পারছেন ক্লাসের জন্য খরচ পড়ে এর চেয়ে অনেক বেশি। এর মধ্যে পড়ে – ঘোড়ার দাম, ঘোড়ার ময়দানের খরচ, ঘোড়ার দেখাশোনার খরচ, এখানে ঘোড়ার দেখাশোনার জন্য চল্লিশ জন কর্মী আছে। তাদের বেতনেও অনেক টাকা প্রয়োজন। অতিরিক্ত খরচ জোগায় রাষ্ট্র।
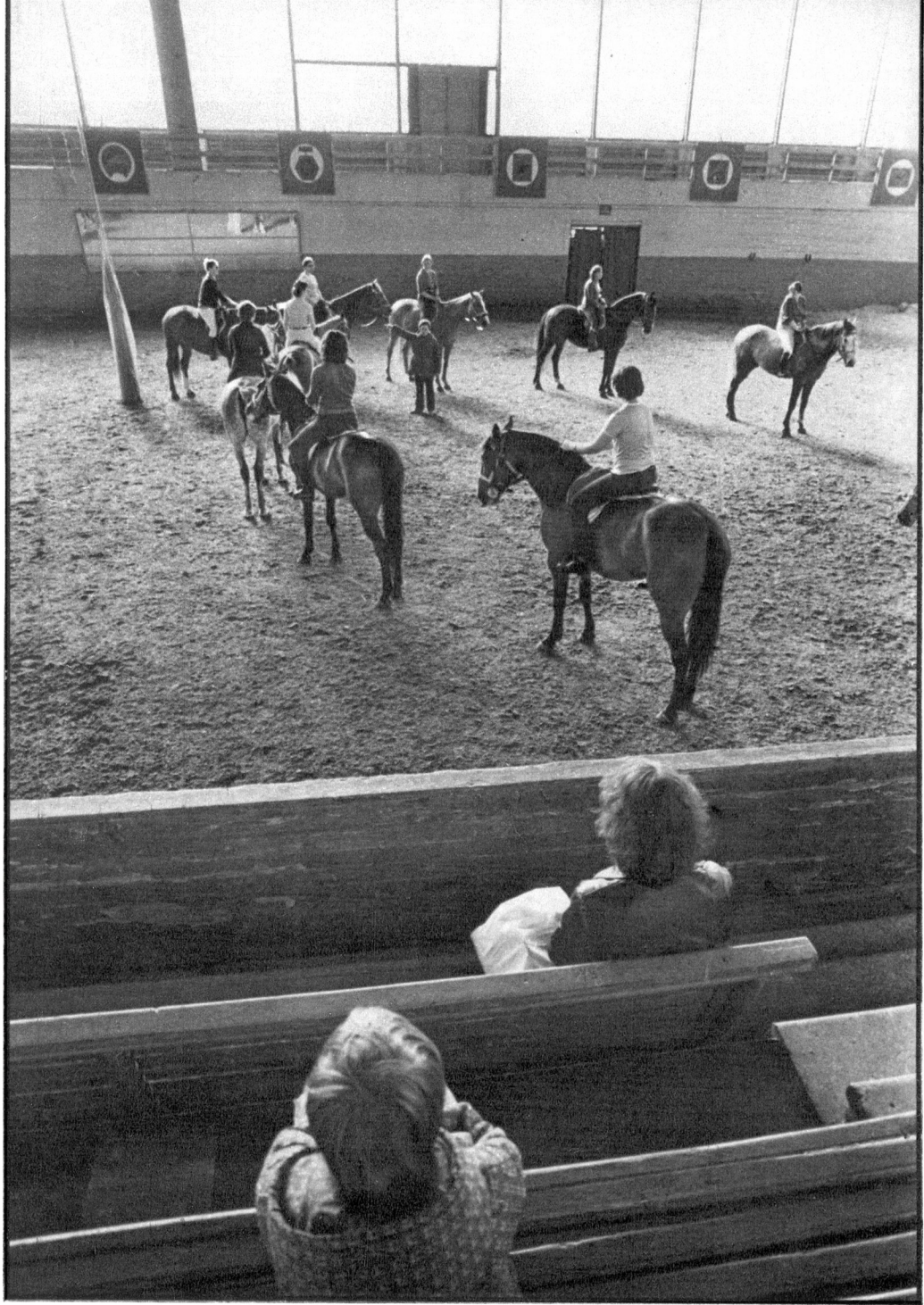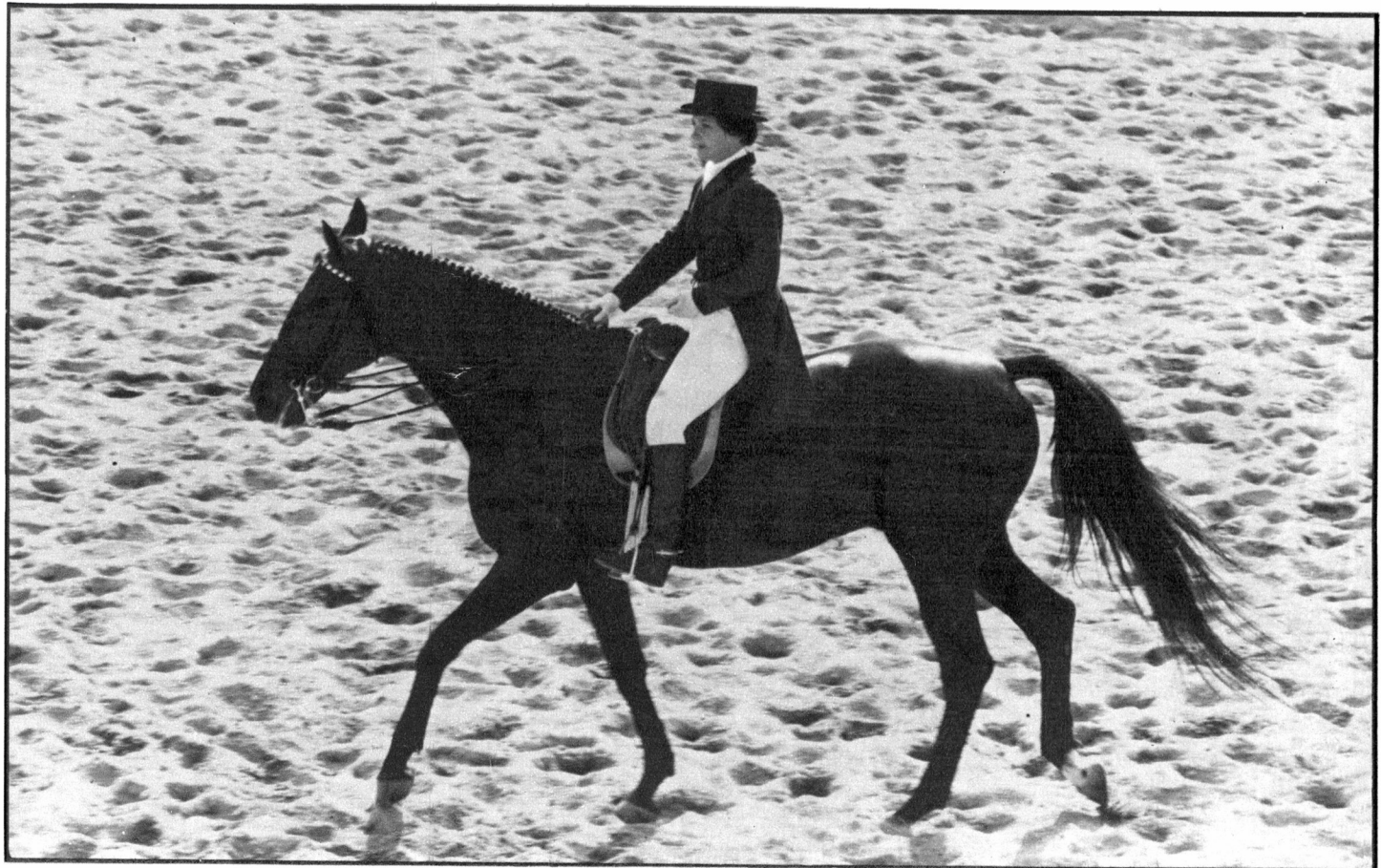
আশা করি, এবার যদি বর্ণনায় আমার মেয়ে যোগ দেয় তাতে আপত্তি করবেন না। নিজের ডা-

য়েরিতে ও লিখেছে:

প্রথম বার আমি ঘোড়দৌড়-মাঠের অশ্বারোহন স্কুলে আসি মায়ের সঙ্গে। তিনি দু'টি টিকিট কিনলেন – একটি 'থিওরি'র জন্য, অন্যটি – ঘোড়ায় চড়া শেখার জন্য। থিওরি ক্লাসে আমাদের দেখানো হল কিভাবে ঘোড়ায় ঠিকমতো জিন পরাতে হয়, ঘোড়ায় বসতে হয়। মুখস্ত করতে দিল গোটা কুড়ির ওপর নিয়ম ও তার জন্য প্রয়োজনীয় ছবি। তারপর, ১২'টার সময় ঘোড়াশালে গিয়ে নিজের ঘোড়া ঠিক করে নিলাম। আমার ভাগ্যে পড়ল ওখ্‌তা নামে ঘোড়াটা। ময়দানে এলাম ওকে নিয়ে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না ওর পিঠে উঠব কীভাবে। এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে সব ভুলে গিয়েছিলাম। একটা মেয়ে সাহায্য করল। এখ্‌তা চলছিল ভালভাবেই। আর আমি ঘোড়ার-পিঠে!'

মায়ের মানসিক অবস্থা ঐ সময়ে কেমন ছিল বোধ হয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। হঠাৎ যদি ওখ্‌তা কোন কাণ্ড করে বসে! পয়তাল্লিশ মিনিট যতক্ষণ না পার হ'ল, মা তার ১৩ বছর বয়সী মেয়ের জন্য আতঙ্কে জড়সড় হয়ে ছিল।

ঘোড়া সাধারণত হয় সূক্ষ্ম অনুভূতির, সদয় ও বিশ্বাসী। সওয়ারকে ভাল ভাবে অনুভব করে সে। তবে নতুন যারা ঘোড়ায়-চড়া শিখতে আসে, তারা অনেক ভুল করে, এবং যেকোনটি ঘোড়াকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারে, আবার – ভয়ও পাইয়ে দিতে পারে। তাই অনভিজ্ঞ সওয়ারদের শান্ত ঘোড়া দেওয়া হয়। প্রথম ১০-১৫টি ক্লাস – শুধু কদমে কদমে চলা।

আবার ডায়েরিতে চোখ বোলানো যাক। 'ঘোড়দৌড়ের ময়দানে যাওয়ার সময় নিজের মনে মনে বলছিলাম: 'অন্ততপক্ষে, তিমুর যেন আমার ভাগ্যে না পড়ে। ওর কাণ্ডকারখানা আমরা 'থিওরি ক্লাসে দেখেছি। আর হবি তো হ, আমার ভাগ্যেই পড়ল তিমুর! আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু বাইরে কোন ভাব দেখালাম না। তারপর শুরু হল কাণ্ড... হয় দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ নয়তো বা লাফ দিয়ে পড়ল অন্য ঘোড়ার গায়ে, তারপর ঠায়, দাঁড়িয়ে থাকল আবার। আমি তার পিঠ থেকে নেমে পড়লাম, ওকে নিয়ে গেলাম ঘোড়াশালে। বাড়ি যাওয়ার পথে ঠিক করলাম আর এখানে আসব না।'

ডায়েরির পরের পাতা ওল্টালাম: 'তবুও আমি গেলাম ঘোড়দৌড়ের ময়দানে...' লুকবো না, বাবা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত আমার ভাল লাগল। কারণ এটা ছিল – ছোটো এলে নিজের উপর সামান্য মেয়ের বিজয়।

ঘোড়ায় চড়া শেখায় কে?

সব ট্রেনারই – মহিলা। সিনিয়ার ট্রেনার – ইয়েলেনা কুলিকোভস্কায়া এবং রোজা গেওর্গিয়েভনা নিকিতিনা, দুজনেই – স্পোর্টস মাস্টার, দুজনেই দেশের জাতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাদের কর্মদিন সাত ঘণ্টার। এর পাঁচ ঘণ্টা–ঘোড়ার ময়দানে। প্রত্যেকের নিজস্ব স্টাইল, নিজের ধরন আছে। রোজা নিকিতিনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। অশ্বক্রীড়ার ক্ষেত্রে ইনি খ্যাতনাম্নী এবং শ্রদ্ধেয়। তিনিই লেনা পেতুশ্‌কোভা ও তার পেপনা নামের ঘোড়াকে খুঁজে বার করেন, যারা পরে অশ্বক্রীড়ার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠে। প্রতি মঙ্গলবার আমার মেয়ে যে অশ্বারোহন স্কুলে যায় তার বর্ণনা এখানেই শেষ করছি। হ্যাঁ, একটা কথা বলি নি। এলগা এবছর অষ্টম শ্রেণী শেষ করেছে। রচনা লেখায় ও সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়েছে। প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে ও বেছে নেয় এই বিষয় – 'অবিস্মরনীয় সাক্ষাৎ'। জানেন কিসের সম্পর্কে? ঠিকই ধরেছেন ঘোড়া সম্পর্কে। শিক্ষিকার মতে রচনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

ভিক্তর ওম্পিশ্যেভ

ফটো: এ. গ্লাজাচেভ, ইউ. লুনকোভ

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুদের কীভাবে চিকিৎসা করা হয়? কে তার ব্যয় বহন করে আর পিতামাতাই বা সে ব্যয়ের কত অংশ দেয়?

মারুহা কাল্দেরোন (পেরু)

সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আমাদের দেশের মেহনতীদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা জোটানোর দায়িত্ব নেয় আমাদের সরকার। বিশেষ করে খুব বেশি মনোযোগ দেয়া হয় শিশু ও মাতৃমঙ্গলের ক্ষেত্রে।

শিশু পলিক্লিনিকগুলির কাজকর্মের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে নিয়মিত দেহ পর্যবেক্ষণ করা আর এতে বিশেষ মনোযোগের বিষয় হল প্রতিষেধক ব্যবস্থামূলক সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ দেহ পরীক্ষা। এক বছর বয়সী শিশুকে চিকিৎসক কম করে হলেও ১৩-১৪ বার পর্যবেক্ষণ করেন, দ্বিতীয় বছরে – প্রতি তিন মাসে এক বার, তৃতীয় বছরে – ছ'মাসে এক বার। প্রাক্ স্কুল বয়সী অপেক্ষাকৃত বড়ো শিশুদের প্রতিষেধক ব্যবস্থামূলক পর্যবেক্ষণ পার হতে হয় সাধারণত বছরে এক বার।

কোনো শিশুর দেহে খুঁত থাকলে কিংবা কাউকে দীর্ঘদিন চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সেজন্যে আছে প্রাক্ স্কুল বয়সীদের প্রচুরসংখ্যক বিশেষ চিকিৎসালয়, ইণ্টানি স্কুল, বনাঞ্চলীয় স্যানাটোরিয়াম স্কুল। কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শিশু আরোগ্য নিকেতন, যেসবে প্রতি বছর চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্যে যায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি কচি ছেলেমেয়ে।

স্যানাটোরিয়ামে প্রতিটি শিশুর চিকিৎসা ও অন্যান্য খরচা বাবদ ব্যয় হয় মাসে ২০০ রুবল। এই ব্যয়ের সম্পূর্ণই বহন করে আমাদের সরকার – স্যানাটোরিয়ামে শিশুদের যাবার জন্যে ব্যবস্থাপত্র পিতামাতারা পায় বিনামূল্যে।

প্রধান সম্পাদিকা ভ. ই. ফেদোতভা
বাংলা ভাষায় প্রকাশনার দায়িত্বশীল সম্পাদিকা: ন. দ. বালিয়াসনিকভা
সম্পাদকমণ্ডলী: গ. স. ভাসিলিয়েভা, গ. স. গালিয়েভা, ম. ই. গুবারেভ, ই. ভ. দেনিসভা, অ. আ. মুজিরিয়া (প্রধান সম্পাদিকার সহকারিণী), ন. ক. রামাজানভা, জ. স. স্মিরনোভা, ল. আ. শুলজেঙ্কো, ম. জ. ইয়ানচুক (প্রধান সম্পাদিকার সহকারিণী)
শিল্পী: ত. মালারেঙ্কো
প্রধান শিল্পী: ত. নভসেলোভা
টেকনিকাল সম্পাদিকা: জ. মালিনোভস্কায়া
সম্পাদনাদপ্তরের ঠিকানা: ১০৩৭৬৪, ২২, কুজনেৎস্কি মোস্ত, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

দরজিনী।

আলোকচিত্রের প্রতিযোগিতা 'আমার মাতৃভূমি'

সোভিয়েত সেনাদের স্মৃতিতে পুন্যার্ঘ্য। ▶

এই ছবিগুলি পাঠিয়েছেন চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রাতিস্লাভা থেকে উইলিয়াম পরশিবিল।

জাতীয় পোশাক।

ভাস্কর।

তাত্রির একটি দৃশ্য।

প্রিয় সঙ্গীত।

সোভিয়েত নারী

ISSN 0201-697X

সূচক 70835

কাজাখস্তানের বিচিত্র গালিচা

আলগাবাস গ্রামে ঘোড়ার জিনও তৈরি হয়।

কাজাখস্তানের বর্ণাঢ্য সূচিকর্মের একটি ডিজাইন – 'মেষশৃংগ'।

পশমী কাপড়ে মলাই দেয়া।

আকাবাস্তাউ গ্রামের চিত্রিত গালিচা।

(পৃঃ ২৮ দেখুন)